মধ্যেই বন্ধ করিয়া রাখিয়া থাকে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত রক্ত বাহিরে না আসিবে বা গদ্দি টানিয়া বাহির না করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত হায়েয ধরা হইবে না। যখন রক্তের চিহ্ন বাহিরের চামড়া পর্যন্ত আসিবে বা তূলা টানিয়া বাহির করিবে, তখন হইতে হায়েয হিসাব হইবে।

১৫। মাসআলা ঃ কোন মেয়েলোক এশার নামায পড়িয়া পাক অবস্থায় ছিদ্রের ভিতর রুই, তূলার গদ্দি রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া যদি তূলার মধ্যে রক্তের চিহ্ন দেখে, তবে যে সময় রক্তের চিহ্ন দেখিবে, সেই সময় হইতেই হায়েয ধরা হইবে—ঘুমের সময় হইতে নহে।

এস্তেহাযার হুকুম

১। মাসআলা ঃ এস্তেহাযার কারণে নামায ও রোযা কোনটাই ছাড়িতে পরিবে না। ইচ্ছা করিলে স্বামী-সহবাস করিতে পারিবে। অবশ্য সত্বর ওযূ করিয়া নামায পড়িতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ নাক দিয়া রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকিলে বা হামেশা পেশাব, পায়খানা, রক্ত বা বায়ু জারী থাকিলে যেরূপ মা'যূরের হুকুম হয়, তদ্রূপ এস্তেহাযার রক্তের কারণেও মা'যূরের হুকুম হইবে। মা'যূরের হুকুম মা'যূরের বয়ানে দেখুন।

নেফাস

১। মাসআলা ঃ সন্তান প্রসব হওয়ার পর পেশাবের রাস্তা দিয়া যে রক্তস্রাব হয়, তাহাকে নেফাস বলে। নেফাসের মুদ্দত ঊর্ধ্ব সংখ্যায় চল্লিশ দিন। চল্লিশ দিন অপেক্ষা বেশী নেফাস হইতে পারে না। কমের কোন সীমা নাই। যদি কাহারও এক দুই ঘন্টা মাত্র রক্তস্রাব হইয়া রক্ত বন্ধ হইয়া যায়, তবে মাত্র ঐ এক দুই ঘন্টাকেই নেফাস বলা হইবে।

২। মাসআলা ঃ যদি কাহারও প্রসবের পর রক্তস্রাব মাত্রই না হয়, তবুও তাহার উপর গোছল ফরয হইবে।

। মাসআলা ঃ প্রসবের সময় সন্তানের অর্ধেকের বেশী বাহির হওয়ার পর যে রক্তস্রাব হইবে উহা নেফাস হইবে। আর যদি অর্ধেকের কম বাহির হওয়ার পর রক্তস্রাব হয়, তবে উহা এস্তেহাযা হইবে। অতএব, যদি হুঁশ থাকে, তবে নামাযের ওয়াক্ত হইলে ঐ অবস্থায়ও ওযূ করিয়া নামায পড়িতে হইবে। নামায না পড়িলে গোনাহ্গার হইবে; এমন কি ইশারায় হইলেও নামায পড়িতে হইবে। খবরদার! হুঁশ থাকিয়া নামায ক্বাযা করিবে না। অবশ্য যদি নামায পড়িলে সন্তানের জীবন নাশ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে সন্তানের জীবন রক্ষার্থে নামায ছাড়িয়া দিবে (ঐ সময় এস্তেগ্ফার পড়িবে)।

৪। মাসআলা ঃ যদি কোন মেয়েলোকের গর্ভপাত হয় এবং সন্তানের এক আধটা অঙ্গ পরিষ্কার দেখা যায়, তবে গর্ভপাতের পর যে রক্তস্রাব হইবে উহাকে নেফাস ধরিতে হইবে। আর যদি সন্তানের মাত্রও আকৃতি না দেখা যায়, শুধু মাত্র একটা মাংসপিণ্ড দেখা যায়, তবে দেখিতে হইবে যে, ইতিপূর্বে অন্ততঃপক্ষে পনর দিন পাক ছিল কি না এবং রক্তস্রাব কমপক্ষে তিন দিন তিন রাত জারী থাকে কি না। যদি এরূপ হয়, তবে উহাকে হায়েয গণ্য করিয়া হায়েযের কয় দিন নামায-রোযা পরিত্যাগ করিতে হইবে। আর যদি এইরূপ না হয়, তবে ঐ রক্তস্রাবকে এস্তেহাযা ধরিতে হইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** যদি কোন মেয়েলোকের প্রসবান্তে চল্লিশ দিনের বেশী রক্তস্রাব হয় এবং তাহার ইহাই প্রথম প্রসব হয়, তবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত নেফাস ধরিতে হইবে। চল্লিশ দিন যখন পুরা হইবে, তখন গোছল করিয়া নামায পড়িতে হইবে। আর যদি ইতিপূর্বে আরও সন্তান প্রসব হইয়া থাকে এবং তাহার নেফাসের মুদ্দতের কোন নিয়ম থাকে, তবে নিয়মের কয়দিন নেফাস হইবে, বেশী কয়দিন এস্তেহাযা হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** কোন মেয়েলোকের নিয়ম ছিল, প্রসবান্তে ত্রিশ দিন রক্তস্রাব হওয়ার, কিন্তু একবার ত্রিশ দিন চলিয়া যাওয়ার পরও রক্ত বন্ধ হইল না; তাহা হইলে এই মেয়েলোক এখন গোছল করিবে না, অপেক্ষা করিবে। যদি পূর্ণ চল্লিশ দিনের শেষে বা চল্লিশ দিনের ভিতর রক্ত বন্ধ হয়, তবে সব কয়দিনই নেফাসের মধ্যে গণ্য হইবে। আর যদি চল্লিশ দিনের বেশী রক্তস্রাব জারী থাকে, তবে ত্রিশ দিন নেফাসের মধ্যে গণ্য হইবে; অবশিষ্ট কয় দিন এস্তেহাযা। চল্লিশ দিনের পর গোছল করিবে এবং নামায পড়িবে। ত্রিশ দিনের পরের দশ দিনের নামায ক্বাযা পড়িবে।

৭। **মাসআলা ঃ** যদি চল্লিশ দিনের পূর্বেই নেফাসের রক্তস্রাব বন্ধ হয়, তবে স্রাব বন্ধ হওয়া মাত্রই গোছল করিয়া নামায পড়িতে হইবে। গোছল করিলে যদি স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা প্রবল হয়, তবে তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িবে। খবরদার! এক ওয়াক্ত নামাযও ক্বাযা হইতে দিবে না।

৮। **মাসআলা ঃ** নেফাসের মধ্যেও হায়েযের মত নামায একেবারে মা'ফ। কিন্তু রোযার ক্বাযা রাখিতে হইবে এবং নামায, রোযা ও স্বামী-স্ত্রীর মিলন সবই হারাম।

৯। **মাসআলা ঃ** কোন মেয়েলোকের যদি ছয় মাসের ভিতরে আগে পরে দুইটি সন্তান প্রসব হয়, যেমন প্রথম সন্তান প্রসব হওয়ার দুই চারি দিন পরে বা দশ বিশ দিন পরে যদি দ্বিতীয় সন্তান প্রসব হয়, তবে প্রথম সন্তান প্রসবের পর হইতেই নেফাসের মুদ্দত গণনা করিতে হইবে—দ্বিতীয় সন্তান হইতে নহে।

নেফাস ও হায়েয ইত্যাদির আহ্‌কাম

১। **মাসআলা ঃ** যে মেয়েলোক হায়েয বা নেফাসের অবস্থায় আছে, অথবা যাহার উপর গোছল ফরয হইয়াছে, তাহার জন্য মসজিদে প্রবেশ করা, কা'বা শরীফের তওয়াফ করা, কোরআন শরীফ পাঠ করা এবং স্পর্শ করা দুরুস্ত নাই, অবশ্য কোরআন শরীফ যদি জুযদানের ভিতর থাকে অথবা রুমাল দ্বারা পেঁচান থাকে, তবে জুযদানের ও রুমালের উপর দিয়া ধরা জায়েয আছে; কিন্তু চামড়া, কাপড় বা কাগজ যদি কোরআন শরীফের সঙ্গে সেলাই করা না থাকে, তবে তাহা দ্বারা উপরোক্ত অবস্থায় কোরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয আছে।

২। **মাসআলা ঃ** যাহার ওযূ নাই তাহার জন্যও কোরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয নহে, অবশ্য পড়াতে বাধা নাই।

৩। **মাসআলা ঃ** যদি টাকা পয়সা (বা নোটের মধ্যে,) অথবা তশ্‌তরী, তাবীয বা যে-কোন পাতা বা কাগজের মধ্যে কোরআনের আয়াত লেখা থাকে, তবে তাহাও উপরোক্ত অবস্থাসমূহে অর্থাৎ, বিনা ওযূতে, হায়েয নেফাস এবং জানাবাতের অবস্থায় স্পর্শ করা জায়েয নহে। অবশ্য যদি এ সমস্ত জিনিস কোন থলির মধ্যে বা অন্য কোন পাত্রের মধ্যে থাকে, তবে সে থলি বা পাত্র ধরিতে বা উঠাইতে পারে।

৪। **মাসআলা ঃ** (উপরোক্ত অবস্থাসমূহে পরনের কাপড়ের আঁচল দিয়া বা গায়ের জামার আস্তিন বা দামান দিয়াও কোরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয নহে।)
অবশ্য যে কাপড়, চাদর, রুমাল উড়নী বা জামা পরিধানে নাই—পৃথক আছে, তাহা দ্বারা কোরআন শরীফ ধরা জায়েয আছে।

৫। **মাসআলা ঃ** যদি পূর্ণ আয়াত না পড়ে ; বরং আয়াতের সামান্য শব্দ অথবা অর্ধেক আয়াত পড়ে, তবে দুরুস্ত আছে, কিন্তু ঐ অর্ধেক আয়াত এত বড় না হওয়া চাই যে, ছোট একটি আয়াতের সামান হইয়া যায়।

৬। **মাসআলা ঃ** হায়েয, নেফাস ও জানাবাত অবস্থায় আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করা জায়েয আছে। অতএব, কোরআনের যে আয়াতের মধ্যে দো'আ (প্রার্থনা) আছে সেই আয়াত যদি কেহ তেলাওয়াতরূপে না পড়িয়া দো'আরূপে পড়িয়া তদ্দ্বারা দো'আ চায়, তবে তাহা জায়েয আছে। যেমন, যদি কেহ উপরোক্ত অবস্থায় অর্থের দিকে লক্ষ্য করিয়া—

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

প্রার্থনারূপে পড়ে বা اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ বা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ দো'আরূপে পড়ে, বা رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْاَخْطَاْنَا الخ মোনাজাতরূপে পড়ে, তবে তাহা জায়েয আছে।

৭। **মাসআলা ঃ** উক্ত অবস্থায় দো'আয়ে কুনূত পড়া জায়েয আছে।

৮। **মাসআলা ঃ** যদি কোন মেয়েলোক মেয়েদেরে কোরআন শরীফ পড়ায়, তবে এমতাবস্থায় বানান করান দুরুস্ত আছে, মিলাইয়া পড়াইবার সময় পূর্ণ আয়াত পড়িবে না বরং একটা কিংবা দুইটা দুইটা শব্দের পর শ্বাস ছাড়িয়া দিবে এবং কাটিয়া কাটিয়া আয়াতকে মিলাইয়া বলিয়া দিবে।

৯। **মাসআলা ঃ** উপরোক্ত অবস্থাসমূহে কলেমা শরীফ পড়া, দুরূদ শরীফ পড়া, অল্লাহ্‌র যেকের করা, এস্তেগফার পড়া, তসবীহ্ পড়া অর্থাৎ, সোব্‌হানাল্লাহ্, আল্‌হামদু-লিল্লাহ্, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আক্‌বর, লা-হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম ইত্যাদি পড়া জায়েয আছে।

১০। **মাসআলা ঃ** হায়েযের অবস্থায়ও ওযূ করিয়া পাক জায়গায় ক্বেব্‌লামুখী হইয়া বসিয়া নামাযের সময়টুকু আল্লাহ্‌র যেকেরে মশ্‌গুল থাকা মোস্তাহাব। যেন নামাযের অভ্যাস ছুটিয়া না যায়, পাক হওয়ার পর নামায পড়িতে ঘাব্‌ড়াইয়া না যায়।

১১। **মাসআলা ঃ** কোন মেয়েলোকের উপর গোছল ফরয হইয়াছিল। গোছল না করিতেই হায়েয আসিয়া গেল। এই অবস্থায় তাহার আর গোছল করার দরকার নাই, যখন হায়েয হইতে পাক হইবে, তখন এক গোছলেই উভয় গোছল আদায় হইয়া যাইবে।

না-পাক জিনিস পাক করিবার উপায়

১। **মাসআলা ঃ** শরীরে বা কাপড়ে যদি শুধু গাঢ় মনি (বীর্য) লাগিয়া শুকাইয়া যায়, তাহার সঙ্গে পেশাব মিশ্রিত না থাকে, তবে তাহা না ধুইয়া শুধু রগড়াইয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে পারিলেও পাক হইয়া যাইবে, কিন্তু ভিজা থাকিলে বা কিছু পেশাব মিশ্রিত থাকিলে, তাহা না ধুইলে পাক হইবে না ; তখন ধোয়া ফরয হইবে।

নামাযের বয়ান

১। মাসআলা ঃ কোন মেয়েলোকের সন্তান প্রসব হইতেছে, কিন্তু এখনও সন্তানের অর্ধেক বাহির হয় নাই, কম-অর্ধেক বাহির হইয়াছে, অথচ নামাযের ওয়াক্ত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় যদি মেয়েলোকটির হুঁশ বুদ্ধি ঠিক থাকিয়া থাকে এবং সন্তানের কোন ক্ষতি হইবার আশঙ্কা না থাকে, তবে তাহার এইরূপ অবস্থায়ও (ওযূ করিয়া হউক বা তায়াম্মুম করিয়া হউক) নামায পড়িয়া লইতে হইবে। আর যদি সন্তানের ক্ষতি হইবার আশঙ্কা থাকে, তবে ঐ সময় নামায পড়িবে না, পরে ক্বাযা পড়িয়া লইবে। তদ্রূপ ধাত্রী যদি এইরূপ অবস্থায় সন্তান প্রসব রাখিয়া দিয়া নামায পড়িতে যায়, এবং সন্তানের বা প্রসূতির জীবনের আশঙ্কা হয়, তবে সে এইরূপ অবস্থায় নামায পড়িতে যাইবে না, তাহারও তখন নামায ছাড়িতে হইবে, পরে প্রসবের কাজ সমাধা করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র ক্বাযা পড়িয়া লইবে।

যৌবনকাল আরম্ভ বা বালেগ হওয়া

১। মাসআলা ঃ কোন একটি মেয়ের ঋতুস্রাব আরম্ভ হইয়াছে, অথবা ঋতুস্রাব হয় নাই বটে; কিন্তু সহবাসের কারণে গর্ভ ধারণ করিয়াছে, অথবা গর্ভ ধারণও করে নাই, ঋতুস্রাবও হয় নাই; কিন্তু স্বপ্নে পুরুষের সঙ্গে সহবাস করিতে দেখিয়া আনন্দ বোধ করিয়াছে এবং বীর্যপাত হইয়াছে, অথবা এই তিন অবস্থার কোনটিই হয় নাই; কিন্তু বয়স (চান্দ্রমাসের হিসাবে) পূর্ণ পনর বৎসর হইয়া গিয়াছে। এই চারি অবস্থাতেই এই মেয়েকে এখন যুবতী বলিতে হইবে এবং শরীঅতের যাবতীয় হুকুম তাহার উপর এখন হইতে পূর্ণরূপে বর্তিবে।

২। মাসআলা ঃ শরীঅতের ভাষায় যুবককে 'বালেগ' এবং যুবতীকে 'বালেগা' বলে এবং যৌবন-প্রাপ্তিকে 'বুলুগ' বা 'বালেগ হওয়া' বলে। নয় বৎসরের পূর্বে কোন মেয়েছেলে এবং বার বৎসরের পূর্বে বেটাছেলে বালেগ হয় না। যদি নয় বৎসরের পূর্বে মেয়ের ঋতুস্রাব হয়, তবে তাহা হায়েয নহে, রোগ। (এইরূপে বার বৎসরের পূর্বে যদি কোন বেটাছেলের বীর্যপাত হয়, তবে তাহাও রোগ।)

পরিশিষ্ট

নামাযের ফযীলত

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

অনুবাদ—নামায নিবৃত্ত রাখে লজ্জাকর কাজ হইতে এবং মন্দ কাজ হইতে অর্থাৎ, নামাযের হক আদায় করিয়া পূর্ণ ভক্তির সহিত নামায আদায় করিতে থাকিলে ক্রমশঃ নামাযীর অন্যান্য সমস্ত গোনাহ্র অভ্যাস ছুটিয়া যায়।

১। **হাদীস ঃ** হযরত ইমাম হাসান বছরী (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (ইনি উচ্চ পর্যায়ের আলেম এবং দরবেশ ছিলেন। তিনি ছাহাবায়ে কেরামের দর্শন লাভ করিয়াছেন। হাফেয মোহাদ্দেস যাহাবী (রঃ) তাঁহার ঘটনাবলী সম্বলিত একখানা পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন) জনাব রসূল (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি এমন নামায পড়ে, যাহার নামায তাহাকে নির্লজ্জতা ও গোনাহ্‌র কাজ হইতে বিরত রাখে না, সে ব্যক্তি আল্লাহ্ হইতে দূরত্ব ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে অগ্রসর হয় নাই। ঐ নামায দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হইবে না এবং সওয়াবও পাইবে না; বরং আল্লাহ্ পাক হইতে দূরত্ব বৃদ্ধি পাইবে। এমন প্রিয় এবাদতের কদর এবং হক্ আদায় না করায় তাহার এই শাস্তি হইবে। অতএব, জানা গেল যে, নামায কবূল হওয়ার কষ্টি পাথর এবং চিহ্ন এই যে, নামাযী নামায পড়ার কারণে গোনাহ্ হইতে বিরত থাকে, কখনও যদি গোনাহ্ হইয়া যায় তৎক্ষণাৎ তওবা করিয়া লয়।

২। **হাদীস ঃ** আবদুল্লাহ্-ইব্‌নে-মাছউদ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত আছে—হযরত নবী আলাইহিস্‌সালাম ফরমাইয়াছেন ঃ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يُطِعِ الصَّلٰوةَ الخ 'যে নামাযের তাবে'দারী না করিবে, তাহার নামায আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হইবে না।' নামাযের তাবে'দারীর অর্থ এই যে, নামায পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নামাযের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিবে অর্থাৎ, লজ্জাকর কাজসমূহ হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। অন্য এক হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরয করিল, অমুক ব্যক্তি সারা রাত্রি জাগিয়া নামায পড়ে; কিন্তু যখন রাত্রি ভোর হয় তখন গিয়া চুরি করে। হযরত (দঃ) বলিলেন, অদূর ভবিষ্যতে উহা তাহাকে তাহার কু-অভ্যাস হইতে ফিরাইয়া আনিবে। হাদীসটি এই—

جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صلعم فَقَالَ اِنَّ فُلَانًا يُصَلِّىْ بِاللَّيْلِ فَاِذَا اَصْبَحَ سَرَقَ قَالَ اِنَّهٗ سَيَنْهَاهُ مَاتَقُوْلُ — درمنثور

৩। **হাদীস ঃ** ওবাদা-ইবনে-ছামেত রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে রেওয়ায়ত আছে ঃ হযরত নবী (আঃ) ফরমাইয়াছেন, 'যে বান্দা ওযূ করিবার সময় উত্তমরূপে ওযূ করে (অর্থাৎ, সমস্ত সুন্নত মোস্তাহাব আদায় করিয়া ওযূ করে) এবং তারপর যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন উত্তমরূপে রুকূ-সজ্‌দা, কেরাআত আদায় করিয়া নামায পড়ে, ঐ নামায তাহার জন্য দো'আ করে এবং বলে, তুমি যেমন আমার যত্ন লইয়াছ এবং আমার হক আদায় করিয়াছ, আল্লাহ্ তা'আলা তদ্রূপ তোমার যত্ন লউক এবং তোমার হক আদায় করুক। তারপর ঐ নামাযকে পূর্ণ উজ্জ্বলতার সহিত ফেরেশ্‌তাগণ আসমানের দিকে লইয়া যান এবং আসমানের দরজা ঐ নামাযের জন্য খুলিয়া দেওয়া হয় অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছিয়া মকবূল হইয়া যায়। আর যে বান্দা ওযূ ভালমত করে না এবং নামাযের কেরাআত, রুকূ-সজ্‌দা ভালমত আদায় করে না, ঐ নামায তাহাকে বদ দো'আ করে এবং বলে, 'তুই যেমন আমাকে নষ্ট করিয়াছিস্, খোদা তোকে ঐরূপ নষ্ট করুক'। তারপর ঐ নামাযকে মলিন বেশে আসমানের দিকে লইয়া যাওয়া হয়, তখন আসমানের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় অর্থাৎ, কবূল হয় না। তারপর ময়লা কাপড়ের মত পোটলা পেঁচাইয়া ঐ নামাযীর মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারা হয় অর্থাৎ, কবূল হয় না এবং সওয়াব পায় না।

৪। **হাদীস ঃ** আবদুল্লাহ্-এব্‌নে মোগাফফাল রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে রেওয়ায়ত আছে ঃ রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু অলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—'সব চেয়ে বড় চোর সে-ই, যে নিজের

নামায চুরি করে, লোকেরা জিজ্ঞসা করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ্! নিজের নামায কেমন করিয়া চুরি করে?' হযরত (দঃ) বলিলেন, যে নামাযের রুকূ, সজ্‌দা ইত্যাদি পূর্ণরূপে আদায় না করে, সে নিজের নামায চুরি করে এবং সবচেয়ে বড় বখীল সে-ই, যে সালাম করিতে কৃপণতা করে। ফলকথা, নামাযের মত সহজ এবং উত্তম এবাদতের হক আদায় না করা বড় রকমের চুরি, যাহার গোনাহ্‌ও অনেক বড়। মুসলমানদের লজ্জা হওয়া চাই যে, নামায পূর্ণরূপে আদায় না করায় তাহাদের এই ধরনের খেতাব দেওয়া হইয়াছে।

৫। হাদীসঃ হযরত আনাস ইব্‌নে-মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—একদা রসূল (দঃ) বাহিরে তশ্‌রীফ আনিয়া দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে রুকূ, সজ্‌দা ঠিকমত আদায় করিতেছে না, তখন রসূল (দঃ) বলিলেন, ঐ ব্যক্তির নামায কবূল হয় না, যে ঠিকমত রুকূ, সজ্‌দা আদায় করে না।

৬। হাদীসঃ হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) অতি উচ্চ পর্যায়ের আলেম ও অতি বড় এবাদতগুযার এবং অতিশয় যিক্‌রকারী ছাহাবী ছিলেন। ছাহাবাদের মধ্যে শুধু হযরত আমর এবনুল আ'ছ তাঁহা অপেক্ষা অধিক হাদীস অবগত ছিলেন। অন্য কোন ছাহাবী তাঁহা অপেক্ষা অধিক হাদীস জানিতেন না। তাঁহার নাম আবদুর রহ্‌মান। "আবু হোরায়রা" তাঁহার কুনিয়ত। প্রথম জীবনে তিনি দরিদ্র ছিলেন। এমনকি ক্ষুধা ও আহারের কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা অতি দীর্ঘ। প্রথম জীবনে প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও দরিদ্রতার কারণে বিবাহও করিতে পারেন নাই। নবী (দঃ)-এর ওফাতের পর তাঁহার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইল। ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাইল। উত্তরকালে মদীনা শরীফের প্রশাসক নিযুক্ত হন। হাকীম হইয়াও জ্বালানি কাঠের বোঝা বহন করিয়া বাজার অতিক্রম করিতেন এবং বলিতেন, হাকীমের অর্থাৎ, আমার জন্য পথ ছাড়িয়া দাও। দেখ এত বড় দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে আসীন থাকিয়াও নিজের কাজ নিজেই করিতেন, কোন প্রকার বড়ত্বের খেয়াল করিতেন না যে, আমি কালেক্টর, কোন অধীনস্থ কর্মচারী দ্বারা এই কাজ করাইয়া লই। অথচ সাধারণ মর্যাদাশালী মানুষ এরূপভাবে কাজ করাকে অপমান বোধ করিয়া থাকে, যাঁহারা নবী-সরদার হযরত (দঃ) হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার সংগে রহিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের তরীকা।

আজ কাল প্রত্যেকেই সামান্যতম পদমর্যাদা লাভ করিলেই নিজেকে অনেক বড় মনে করিতে থাকে। আবার ইসলাম এবং রসূলে মকবূল (দঃ)-এর মহব্বতের দাবী করিয়া থাকে। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে রসূলের মহব্ববত ঐ ব্যক্তির অন্তরে আছে, যে ব্যক্তি তাঁহার বিধি-নিষেধ পালন করে এবং প্রত্যেক কাজে তাঁহার সুন্নতের তাবেদারী করে। কবি বলেনঃ

و كل يدعى وصلا بليلى

وليلى لا تقـر لهم بذاك

অর্থাৎ, প্রত্যেকেই দাবী করে আমি লায়লার মিলন লাভ করিয়াছি, অথচ লায়লা তাহাদের এই দাবী স্বীকার করে না।

অতএব, তাহাদের দাবী কিরূপে সত্য হইতে পারে? এইরূপে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূলের মহব্বতের দাবী করে, অথচ কোরআন-হাদীসের বিপরীত চলে এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের বিধানসমূহ অমান্য করে, তবে তাহাদের দাবী কিরূপে সত্য হইতে পারে? হাদীসে পরিষ্কার উল্লেখ আছে, সত্য পথ উহাই যে পথে আল্লাহ্‌র রসূল ও তাঁহার ছাহাবীগণ রহিয়াছেন। এই হাদীসে

স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, যে পথ ও মত আল্লাহ্, ও রসূলের খেলাফ, উহা গোম্‌রাহী। ঐ পথ অবলম্বনকারীর প্রতি আল্লাহ্‌র রসূল অতিশয় নারায।

হযরত অবূ হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি এতীম অবস্থায় প্রতিপালিত হইয়াছি এবং মিসকীন অবস্থায় মদীনায় হিজরত করিয়াছি। আমি গযওয়ানের কন্যার পেটে-ভাতে চাকর ছিলাম। আমার শর্ত ছিল, পথিমধ্যে কখনও পায়ে হাঁটিয়া কখনও যানে আরোহণ করিয়া যাইব। আমি গান গাহিয়া তাহার উট হাঁকাইতাম, তাহার জন্য আমি জ্বালানি কাঠ কাটিয়া আনিতাম, যখন পথিমধ্যে সে বিশ্রাম করিত। আল্লাহ্‌র শোক্‌র যিনি দ্বীন ইসলামকে মজবুত করিয়াছেন এবং আবূ হোরায়রাকে ইমাম ও নেতা বানাইয়াছেন। আর ইহা দ্বারা তিনি খোদার এই নেয়ামতের শোক্‌র আদায় করিয়াছেন। গর্ব ও অহংকারে নিজকে নেতা বলেন নাই। আল্লাহ্‌র নেয়ামতের প্রকাশ ও উহার শোক্‌র আদায় করার জন্য মানুষ যে মর্তবা পায়, উহা প্রকাশ করা সওয়াবের কাজ। গর্ব ও অহংকারবশতঃ উহা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ এবং হারাম।

হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বলেন, জনাব রসূল (দঃ) আমাকে বলিয়াছেন, গণীমতের মাল হইতে আমার কাছে চাও না কেন? আমি বলিলাম, আমি ইহাই চাই যেই আল্লাহ্ আপনাকে যে এল্‌ম শিখাইয়াছেন তাহা আমাকে শিক্ষা দেন। তখন রসূল (দঃ) আমার পিঠে যে কম্বল ছিল উহা টানিয়া নামাইলেন। অতঃপর আমার এবং তাঁহার মাঝখানে বিছাইলেন। এমনকি কম্বলের উকুনগুলি আমি দেখিতে ছিলাম। বরকতস্বরূপ আমাকে কয়েকটি কথা বলিলেন। রসূল (দঃ) কথাগুলি শেষ করিয়া বলিলেন, গুটাইয়া লও। অতঃপর তোমার বক্ষদেশে স্থাপন কর। হযরত আবূ হোরায়রা বলেন, ইহার ফল এই দাঁড়াইল যে, হুযূর (দঃ) যাহাকিছু বলিতেন, আমি একটি অক্ষরও ভুলিতাম না। অর্থাৎ, মেধাশক্তি খুব বৃদ্ধি পাইল। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিদিন বার হাজার বার তওবা এস্তেগ্‌ফার করি। (অর্থাৎ— اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ কিংবা এধরনের অন্য কিছু বার হাজার বার পড়িতেন।) তাঁহার নিকট দুই হাজার গিরাযুক্ত একটি রশি ছিল। শোয়ার পূর্বে ২ হাজারবার "সোবহানাল্লাহ্" না পড়িয়া শুইতেন না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) যিনি উচ্চস্তরের ছাহাবী এবং আলেম ছিলেন, সুন্নতের তাবেদারী এত পরিমাণে করিতেন যে, লোকের আশংকা হইত, এই পরিশ্রমের দরুন হয়ত জ্ঞানহারা হইয়া যাইবেন। হুযূর (দঃ) তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ

نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْكَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ○

অর্থাৎ, আবদুল্লাহ্ অতি উত্তম লোক, যদি সে তাহাজ্জুদের নামায পড়িত! ইহার পর হইতে তিনি কখনও তাহাজ্জুদের নামায ছাড়েন নাই। রাত্রে কম ঘুমাইতেন। তিনি বলিতেন, হে আবূ হোরায়রা (রাঃ)! নিশ্চয়, তুমি আমাদের (ছাহাবাদের) মধ্যে হুযূর (দঃ)-এর সংসর্গ সমধিক লাভ করিয়াছ এবং আমাদের মধ্যে হুযূরের হাদীস তুমিই সমধিক অবগত আছ। হযরত তাফায়ী (রাঃ) বলেনঃ আমি ছয় মাস কাল আবূ হোরায়রার মেহ্‌মান ছিলাম। ছাহাবাদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক আবেদ এবং অতিথিপরায়ণ ছিলেন। আবূ ওসমান মাহ্‌দী (একজন বড় তাবেয়ী) বলেন, আমি একাধারে সাত দিন আবূ হোরায়রার মেহ্‌মান ছিলাম। তখন দেখিয়াছি, তিনি তাঁহার পত্নী এবং তাঁহার খাদেম রাত্রিকে তিন অংশে ভাগ করিয়া পালাক্রমে নামায পড়িতেন। একজন নামায পড়িতেন, এবং অপর দুইজন আরাম করিতেন, আবার দ্বিতীয় জন জাগিয়া নামায পড়িতেন, অন্যরা আরাম করিতেন, আবার তৃতীয় জন জাগিয়া এবাদত করিতেন, অন্যরা ঘুমাইতেন।

আবূ হোরায়রা বলেন, জনাব রসূল (দঃ) ফরমাইয়াছেন, তোমাদের কেহ যদি এই খুঁটির মালিক হইত, তবে ঐ ব্যক্তি কিছুতেই সেই খুঁটিকে নষ্ট হইতে দিত না; সুতরাং কি করিয়া তোমরা এমন কাজ কর যাহাতে নামায নষ্ট হইয়া যায়, যে নামায শুধু আল্লাহ্‌র জন্য। অতএব, তোমরা যথাযথভাবে নিজের নামায আদায় কর। কেননা, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণাঙ্গ নামায ছাড়া কবূল করেন না।

৭। **হাদীসঃ** আবদুল্লাহ্-ইবনে-আমর রাযিয়াল্লাহু হইতে রেওয়ায়ত আছে, একজন লোক হযরত নবী আলাইহিস্‌সালামের দরবারে হাযির হইয়া আরয করেনঃ হুযূর (ঈমানের পর) দীন-ইসলামে সবচেয়ে ভাল কাজ কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, 'ফরয নামায'। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিল, তারপর? হযরত (দঃ) বলিলেন, 'নামায'। লোকটি তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিল, তারপর? হযরত (দঃ) বলিলেন, 'নামায'। (নামায যে অতি বড় মর্তবার এবাদত এবং ইহা দ্বারাই যে ইসলাম ঠিক থাকিতে পারে, অন্যথায় ইহ-পরকালের ধ্বংস অনিবার্য। এই কথা উম্মতকে বুঝাইবার জন্যই তিনবার জিজ্ঞাসার উত্তরে হযরত প্রত্যেকবার 'নামায' বলিয়া উত্তর দিয়াছেন। তিনবারের পর চতুর্থবার যখন ঐ লোকটি সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হুযূর, তারপর? হযরত তখন বলিলেন, তারপর আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদ। শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র দ্বীনকে জয়যুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে, জান-মাল উৎসর্গ করিয়া দেওয়াকেই বলে জেহাদ। লোকটি বলিল, হুযূর, আরও কিছু আরয আছে, আমার পিতা-মাতা জীবিত আছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কি বলেন? হযরত বলিলেন, আমি তোমাকে তোমার মাতা-পিতার সহিত ভাল ব্যবহার করিবার আদেশ করিতেছি। অর্থাৎ, তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার কর। তাহাদেরকে কষ্ট দিও না। তাহাদেরকে কষ্ট দেওয়া হারাম। যে কাজে তাহাদের কষ্ট হয় তাহা করিও না। অবশ্য সেই কাজ পিতা-মাতার হকের চেয়ে বড় না হওয়া চাই এবং উহাতে আল্লাহ্‌র নাফরমানী যেন না হয়। কষ্ট অর্থ শরীঅত যাহাকে কষ্ট বলিয়াছে, ইহা অপেক্ষা বেশী হক আদায় করা মোস্তাহাব; যরূরী নহে। এ ব্যাপারে সাধারণ লোকেরা বড়ই ভুল করিয়া বসে। লোকটি বলিল হুযূর, আমি সেই যাতে-পাক আল্লাহ্ তা'আলার কসম করিয়া বলিতেছি, যিনি আপনাকে সত্য নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন, আমি নিশ্চয়ই ওয়ালেদাইনের খেদমত ছাড়িয়া জেহাদ করিতে যাইব। হযরত বলিলেন, সে কথা তুমি নিজে ভালরূপে চিন্তা করিয়া বুঝ যে, এতদুভয়ের কোন্‌টির প্রতি তোমার মন ঝুঁকে, তাহাই কর। অন্য এক হাদীসে জেহাদের চেয়ে পিতা-মাতার খেদমতকে বড় বলা হইয়াছে। তাহার উত্তর এই যে, জেহাদ আল্লাহ্‌র হক এবং পিতা-মাতার খেদমত বান্দার হক। আল্লাহ্‌র হক আল্লাহ্ গফুরোর রহীম তওবা করিলে মা'ফ করিয়া দিবেন; বান্দার হক তওবা দ্বারা মা'ফ হইবে না। অপর উত্তর হইল, রসূল (দঃ)-এর খেদমতে বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্নকারী আসিত। তিনি প্রশ্নকারীর অবস্থা অনুযায়ী উত্তর দিতেন।

৮। **হাদীসঃ** হযরত আবূ আইয়ূব আনছারী রাযিয়াল্লাহু হইতে রেওয়ায়ত আছে—হযরত নবী আলাইহিস্‌সালাম ফরমাইয়াছেন—'নামাযের উছীলায় নামাযীর পূর্বের নামায হইতে এই নামায পর্যন্ত সকল (ছগীরা) গোনাহ্ মা'ফ হইয়া যায়।' —মঃ আহ্‌মদ

৯। **হাদীসঃ** আবূ উমামা বাহেলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে রেওয়ায়ত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—এক ফরয নামায অন্য ফরয নামাযের সহিত মিলিত হইয়া তাহার পূর্ববর্তী সমস্ত (ছগীরা) গোনাহ্ মুছিয়া ফেলে। এইরূপে এক জুমু'আর

নামায অন্য জুমু'আর নামাযের সহিত মিলিত হইয়া তাহার পূর্ববর্তী (সপ্তাহের) সমস্ত ছগীরা গোনাহ্ মুছিয়া দেয়। (অন্য এক হাদীসে আছে, জুমু'আর পরবর্তী তিন দিন পর্যন্ত গোনাহ্ মা'ফ হয়) এইরূপে এক রমযান শরীফের রোযা অন্য রমযানের রোযার সহিত মিলিত হইয়া তাহার পূর্ববর্তী সমস্ত ছগীরা গোনাহ্ মা'ফ করাইয়া দেয়। এইরূপে প্রত্যেক হজ্জ মিলিত হইয়া তাহার পূর্ববর্তী সমস্ত ছগীরা গোনাহ্ মা'ফ করাইয়া দেয়। স্বামী বা অন্য কোন মাহ্রম রেশ্তাদারের সঙ্গে ছাড়া মেয়েলোকের হজ্জ করা জায়েয নহে। —তাব্রানী

(সন্দেহ ভঞ্জন) কেহ হয়ত প্রশ্ন করিতে পারে যে, যাহার ছগীরা গোনাহ্ নাই তাহার কি ফযীলত হাছিল হইবে? অথবা পাঞ্জেগানা নামাযের দ্বারা যখন সব ছগীরা গোনাহ্ মা'ফ হইয়া গেল, তখন ত আর ছগীরা গোনাহ্ রহিল না, তবে জুমু'আ, রমযান এবং হজ্জের দ্বারা কি মা'ফ হইবে? উত্তর এই যে, যাহাদের ছগীরা গোনাহ্ নাই, অথবা ছিল কিন্তু পাঞ্জেগানার দ্বারা মা'ফ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের বাকী আমলের দ্বারা মর্তবা বর্ধিত হইবে।

১০। হাদীসঃ উপরোক্ত ছাহাবী রেওয়ায়ত করেন, হযরত নবী আলাইহিস্সালাম বলিয়াছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ এইরূপ যেন, তোমাদের বাড়ীর দরজার সামনে মিষ্টি পানির একটি নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং তোমরা তাহাতে দৈনিক পাঁচবার গোছল করিতেছ। এইরূপ হইলে (বল ত দেখি) শরীরে কোন ময়লা থাকিতে পারে কি? (নিশ্চয় না)।

১১। হাদীসঃ আবূ হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু রেওয়ায়ত করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, 'নিশ্চয় জানিও, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার ফরয নামাযের হিসাব লওয়া হইবে। যদি নামাযের হিসাবে বান্দা উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তবে অন্যান্য হিসাবেও উত্তীর্ণ হইবে।' (কারণ, নামাযের বরকতে সাধারণতঃ অন্যান্য আমলও দুরুস্ত হইয়া যায়)। আর যদি নামাযের হিসাবে অকৃতকার্য হয়, তবে অন্যান্য আমলের হিসাবেও অকৃতকার্য হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্তাদের বলিবেন, 'দেখ, আমার বান্দার আমলনামার মধ্যে কিছু নফল নামাযও আছে কি না? যদি কিছু নফল নামায থাকে, তবে তাহা দ্বারা ফরয নামাযের মধ্যে যে ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে তাহা পূর্ণ করা হইবে।' এইরূপে অন্যান্য ফরয এবাদতগুলিরও (অর্থাৎ, রোযা, যাকাৎ এবং হজ্জেরও) হিসাব লওয়া হইবে এবং ফরযের মধ্যে ত্রুটি থাকিলে নফলের দ্বারা ত্রুটি পূর্ণ করা হইবে। নফলের দ্বারা যে ফরযের ত্রুটি পূর্ণ করিবেন, ইহা শুধু আল্লাহ্র অপরিসীম রহ্মত দ্বারাই হইবে। (নতুবা আইন অনুসারে নফল দ্বারা ফরযের ক্ষতিপূরণ হইতে পারে না। আর যাহার ফরয ঠিক নাই এবং নফলও নাই তাহাকে আযাব দেওয়া হইবে। অবশ্য যদি আল্লাহ্ পাক রহম করেন, তবে স্বতন্ত্র কথা।

১২। হাদীসঃ হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূল (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার প্রতি যেসমস্ত এবাদত নির্ধারিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে নামায সর্বোত্তম। কাজেই বাড়াইতে পারিলে বাড়ান উচিত। অর্থাৎ, বেশী সওয়াবের জন্য বেশী নামায পড়া উচিত।

১৩। হাদীসঃ ওবাদা এবনে-ছামেত রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে রেওয়ায়ত আছে, হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, জিব্রায়ীল আলাইহিস্সালাম আল্লাহ্ পাকের দরবার হইতে প্রেরিত হইয়া আমার নিকট আসিয়া বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, 'হে মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি আপনার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করিয়াছি। যে ব্যক্তি ঐ নামাযগুলি পূর্ণরূপে ওযূ করিয়া সঠিক ওয়াক্তের পাবন্দী করিয়া ভালরূপে রুকূ, সজ্দা করিয়া

আদায় করিবে, তাহার জন্য আমি এই কথার যিম্মা লইতেছি যে, ঐসব নামাযের ওছীলায় তাহাকে আমি বেহেশ্‌তে দাখেল করিয়া দিব। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আমার সহিত দেখা করিবে এমন অবস্থায় যে, সে নামাযের মধ্যে ত্রুটি করিয়াছে, তাহার জন্য আমার এখানে কোন যিম্মাদারী নাই। আমার ইচ্ছা হইলে তাহাকে আযাবও দিতে পারি, ইচ্ছা হইলে দয়া করিয়া ছাড়িয়াও দিতে পারি।'

১৪। হাদীসঃ হাদীস শরীফে আছে, 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে, ভক্তিভরে ওযূ করিয়া দুই রাকা'আত নামায এমনভাবে পড়িবে, যাহাতে ভুলত্রুটি না হয়, (উত্তমরূপে হুযূরে-কলবের সহিত নামায পড়ে,) তবে তাহার পূর্বেকার সমস্ত (ছগীরা) গোনাহ্ আল্লাহ্ তা'আলা মা'ফ করিয়া দিবেন।' (এই নামাযকেই তাহিয়্যাতুল ওযূ বলে।)

১৫। হাদীসঃ 'নামাযের দ্বারা মো'মেন বান্দার অন্তঃকরণে নূর পয়দা হয়। অতএব, তোমরা যে যত পার নামায দ্বারা নিজের অন্তঃকরণে নূর বৃদ্ধি করিয়া লও।'

১৬। হাদীসঃ 'যদি আল্লাহ্ তা'আলার তওহীদ (অর্থাৎ, খোদাকে এক অদ্বিতীয় জানা) এবং নামায হইতে শ্রেষ্ঠ কোন জিনিস থাকিত, তবে নিশ্চয়ই ফেরেশ্‌তাদের জন্য তাহা নির্ধারিত করা হইত। কোন ফেরেশ্‌তা (চিরজীবন) রুকূতে আছেন, কোন ফেরেশ্‌তা (চিরজীবন) সজ্‌দায় আছেন।' —দাইলামী। এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবাদত আর নাই। কেননা, ফেরেশ্‌তাগণ—যাহাদের কাজই শুধু এবাদত করা, তাহারাও পূর্ণ নামায পায় নাই। আমাদের কত বড় সৌভাগ্য যে, আমরা হযরতের তোফায়েলে আল্লাহ্‌র রহ্‌মতে পূর্ণরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত পাইয়াছি। রত্ন পাইয়া যে যত্ন না করে তাহার চেয়ে হতভাগা আর কে আছে?

১৭। হাদীসঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত আছে, রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, 'তোমরা নামাযের মধ্যে মৃত্যুকে স্মরণ কর। কেননা, যে নামাযের মধ্যে মৃত্যুকে স্মরণ করিবে, সে নিশ্চয়ই নামায উত্তমরূপে আদায় করিবে। সেই ব্যক্তির নামাযের মত নামায পড়, যে মনে করে যে, এই নামাযই তাহার জীবনের শেষ নামায। এমন কাজ করিও না, যাহা করিয়া আবার মা'ফ চাহিতে হয়।'

১৮। হাদীসঃ 'নামায যত লম্বা হইবে, ততই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয় হইবে।'

১৯। হাদীসঃ হাদীস শরীফে আছে, 'ঐ ব্যক্তির নামায (পূর্ণাঙ্গ) হয় না, যে নামাযে আজেযী (একাগ্রতা ও নম্রতা) প্রকাশ করে না।' কারণ, যে ব্যক্তি বেপরোয়াভাবে নামায পড়িবে, সে নিশ্চয়ই এদিক-ওদিক তাকাইবে এবং অযথা নড়াচড়া করিবে। যদি একাগ্রতার সহিত নামায পড়ে, তবে এদিক-ওদিক না দেখিয়া ভালরূপে নামায পড়িবে, বে-আদবী করিবে না। (অর্থাৎ, রুকূ, সজ্‌দা, কলেমা, কেরাআত, ক্বেয়াম, কুউদ সব মনোযোগের সহিত আদায় করিবে।)

২০। হাদীসঃ হযরত আলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (দঃ) ইহধাম ত্যাগকালে বলিয়াছেনঃ '(খবরদার) নামায! (খবরদার) নামায! দাসদাসীর ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর।' (খবরদার! অধীনস্থ দাসদাসী, ইত্যাদির উপর যুলুম করিও না। খবরদার! অধীনস্থদের উপর যুলুম করিও না।) এই দুই ক্ষেত্রেই প্রিয় রসূল জীবনের শেষ মুহূর্তেও উম্মতকে এই পাপরূপ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়া হইতে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন যুগে লোকের নামাযের আগ্রহ এত বেশী ছিল যে, ফরযের ত কথাই ছিল না, নফল আদায় করার জন্যও অতিশয় আগ্রহান্বিত ছিল।

মন্‌সূর ইবনে যাযান তাবেয়ীর জীবনীতে লেখা আছে যে, তিনি সূর্যোদয়ের পর হইতে (ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়টুকু বাদ দিয়া) আছর পর্যন্ত অনবরত নফল নামায পড়িতেন। এবং আছর হইতে

মাগরিব পর্যন্ত সোব্হানাল্লাহ্ (তসবীহ্) পড়িতেন। অতঃপর মাগরিবের নামায পড়িতেন। তাঁহার অবস্থা এইরূপ ছিল যে, তাঁহাকে যদি কেহ বলিত, মালাকুল মওত দরজায় দাঁড়াইয়া আছে, তবুও তিনি তাঁহার নেক আমলের মধ্যে বিন্দুমাত্রও বৃদ্ধি করিতে পারিতেন না। কারণ, মৃত্যু আসন্ন জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই সে নেক আমল বেশী করিবে; কিন্তু তিনি প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যুকে হাযির মনে করিয়া নেক আমল এত বাড়াইয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার আর সময়ই ছিল না। মনসুর ইব্নে-মো'তামের তাবেয়ীর জীবনীতে লিখিত আছে, তিনি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত অনবরত দিনে রোযা রাখিতেন। এবং সারারাত নামায পড়িতেন, আর আযাবের ভয়ে কাঁদিতেন। এইরূপ করিতে করিতে তাঁহার অবস্থা এমন হইয়াছিল যে, তাঁহাকে কেহ নামায পড়িতে দেখিলে মনে করিত, তিনি বোধহয় এখনই মরিয়া যাইবেন। অর্থাৎ, নামাযের মধ্যে এত কাঁদিতেন যেন তিনি তাঁহার অন্তিমকাল চাক্ষুষ দেখিতেছেন এবং সেজন্য কাঁদিয়া কাটিয়া গোনাহ্ মা'ফ করাইয়া জীবনের শেষ নামায সমাপন করিয়া দুনিয়া হইতে রোখ্ছত হইতেছেন। সারা রাত এইরূপ কাঁদাকাটি ও এবাদৎ বন্দেগী করিয়া সকাল বেলায় তিনি চোখে সুর্মা লাগাইয়া পানি দ্বারা ঠোঁট মুখ তাজা করিয়া এবং মাথায় তেল মাখিয়া লোকের সম্মুখে আসিতেন। এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মা বলিতেন, মনসূর! তুমি কি কাহাকেও খুন করিয়া আসিয়াছ যে, এইরূপে নিজেকে লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছ? মনসূর বলিতেন, মা, মানুষের প্রবৃত্তিতে সুখ্যাতি ও সুনাম অর্জনের লিপ্সা যে কি মারাত্মক ব্যাধি তাহা আমি বেশ জানি; সেই জন্যই আমি এইরূপ করি, যাহাতে লোকে আমাকে পীর বুযুর্গ বলিয়া মশহুর না করিয়া বসে এবং আমিও কুপ্রবৃত্তির ফাঁদে না পড়ি। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে দৃষ্টি শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কুফার কাযীর পদ গ্রহণ করিবার জন্য ইরাকের আমীর তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি উহা অস্বীকার করিলেন। এই জন্য তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করা হয়। অবশ্য পরে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। কেহ কেহ বলিয়াছেন, (বাধ্য হইয়া) দুই মাস কাযীর পদে বহাল ছিলেন।

ছাহেবান! একটু চিন্তা করুন, ইঁহারা আল্লাহ্র এবাদতে কেমন আসক্ত ছিলেন এবং দুনিয়ার প্রতি কেমন বিতৃষ্ণ ছিলেন! সরকারী পদ বিনা চেষ্টা ও অন্বেষণে পাইতেন, যাহাতে উচ্চ সম্মান ও প্রচুর ধনের অধিকারী হইতে পারিতেন; যে জন্য মানুষ বহু চেষ্টা তদবীর করিয়া থাকে। কিন্তু তিনি সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, কারারুদ্ধ হইলেন। প্রত্যেক মুসলমানের এই আদর্শ গ্রহণ করা উচিত। প্রয়োজন মত খাওয়া পরার ব্যবস্থা করিয়া বাকী সময় আল্লাহ্র স্মরণে কাটান উচিত।

(হাদীস ঃ যে ইচ্ছাপূর্বক নামায তরক করে, সে বাহ্যতঃ কাফের হইয়া যায়। অন্য হাদীসে আছে, 'যাহার নামায নাই তাহার ধর্ম নাই।')

২১। হাদীস শরীফে আছে, 'যে দিন-রাতের মধ্যে ফরয ছাড়া অতিরিক্ত বার রাকা'আত নামায পড়িবে, তাহার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশ্তে একখানা ঘর প্রস্তুত করিবেন।' (অর্থাৎ ফজরের দুই রাকা'আত, যোহরের ছয় রাকা'আত—চারি রাকা'আত ফরযের আগে দুই রাকা'আত ফরযের পরে, মাগরিব এবং এশার ফরযের পর দুই দুই রাকা'আত সুন্নত।)

—জামে ছগীর

২২। হাদীস শরীফে আছে, 'যে মাগরিব এবং এশার মাঝখানে ছয় রাকা'আত নামায এমনভাবে পড়িবে যে, তাহার মধ্যে কোন খারাব কথা বলিবে না, তাহার জন্য বার বৎসরের এবাদতের সমান সওয়াব লেখা হইবে।' —জামে'ছগীর

২৩। হাদীস শরীফে আছে, 'যে একা একা এমনভাবে দুই রাকা'আত নামায পড়িবে যে, এক আল্লাহ্ তা'আলা এবং কেরামুন কাতেবীন ছাড়া অন্য কেহ দেখিতে না পায়, তাহার জন্য দোযখ হইতে মুক্তি লিখিয়া দেওয়া হইবে।' অর্থাৎ, যে হামেশা এইরূপ করিতে থাকিবে, তাহাকে গোনাহ্‌র কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকার তওফীক দান করা হইবে, ফলে দোযখ হইতে নাজাত পাইবে।

২৪। হাদীসে আছে, 'যে চাশ্‌তের বার রাকা'আত নামায পড়িবে, তাহার জন্য আল্লাহ্ পাক বেহেশ্‌তের মধ্যে সোনার অট্টালিকা নির্মাণ করিবেন।'

২৫। হাদীসঃ 'চাশ্‌তের চারি রাকা'আত এবং যোহরের পূর্বে চারি রাকা'আত নামায যে পড়িবে, আল্লাহ্ তাহার জন্য বেহেশ্‌তে একখানা ঘর তৈয়ার করিবেন।'

২৬। হাদীসে আছে, 'যে মাগরিব এবং এশার মাঝখানে বিশ রাকা'আত নামায পড়িবে আল্লাহ্ পাক তাহার জন্য বেহেশ্‌তে একটি বাড়ী তৈয়ার করিবেন।'

২৭। হাদীস শরীফে আছে, যে আছরের আগে চারি রাকাআত (নফল) নামায পড়িবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপর দোযখের আগুন হারাম করিয়া দিবেন।' অর্থাৎ এইসব নামায যাহারা হামেশা পড়িবে, তাহারা নেক কাজ করিবে এবং বদ কাজ পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবে, ফলে দোযখ হইতে মুক্তি এবং বেহেশ্‌ত লাভ করিবে। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে, নফল এবাদত ঐ পরিমাণই আরম্ভ করা উচিত যাহা সব সময় আদায় করা যায়। অবশ্য যদি কোন ওযরবশতঃ কখনও ছুটিয়া যায়, তবে সে ভিন্ন কথা। নফল শুরু করিলে হামেশা উহাতে লাগিয়া থাকা উচিত। শুরু করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া শুরু না করা অপেক্ষা অধিক খারাব।

২৮। হাদীসঃ 'আল্লাহ্‌র রহ্‌মত বর্ষিত হউক ঐ ব্যক্তির উপর—যে আছরের (ফরযের) আগে চারি রাকা'আত নামায পড়ে।' (হে মুসলমান ভাই বোনেরা! এই হাদীসের বিষয়বস্তুর উপর কোরবান হও। লক্ষ্য কর, সামান্য পরিশ্রমে কত বড় দরজা পাওয়া যায়। হুযূরে আকরাম (দঃ)-এর দো'আর বরকত এবং গোনাহ্ হইতে বাঁচিবার তওফীক-এর প্রতি যে পরিমাণ মর্যাদা প্রদর্শন করা হয় এবং এই এবাদত নির্ধাররণের প্রতি আল্লাহ্‌র যে পরিমাণ শোক্‌র আদায় করা হয়, সবই অতি নগণ্য। জনাব রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর দো'আ ভাগ্যবান ব্যক্তিই পাইতে পারে। সকাল-সন্ধ্যা উভয় ওয়াক্তে আমাদের 'আমলনামা' হযরত রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খেদমতে পেশ করা হয়। যে ব্যক্তি নেক কাজ করে এবং তাঁহার উৎসাহিত এবাদতকে কার্যে পরিণত করে, তাহার প্রতি তিনি খুব সন্তুষ্ট হন। হুযূরের সন্তুষ্টিতে উভয় জাহানে রহ্‌মত এবং শান্তি লাভ হয়। কবি সত্যই বলিয়াছেনঃ

فَاِنَّ فِىْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَ ضَرَّتَهَا
وَفِىْ عُلُوْمِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

অর্থাৎ, আপনার দান সাখাওয়াতে দুনিয়া ও আখেরাত বিদ্যমান, আপনার জ্ঞানে লওহে মাহ্‌ফূযের এল্‌ম বিদ্যমান। মোটকথা, আপনার কৃপাদৃষ্টি এবং দানশীলতার বরকতে দীন দুনিয়ার নেয়ামতসমূহে লাভ হইতে পারে। আপনার শিক্ষায় লওহে মাহফূযের জ্ঞান লাভ হইতে পারে। ঐ এল্‌ম লাভের দুইটি পন্থা আছে। একটি হইল হুযূরের বর্ণিত হাদীসসমূহে যে গুপ্ত রহস্য নিহিত আছে, আল্লাহ্‌র বিশিষ্ট বান্দাগণের অন্তরে উহা বিকশিত হয়। অপরটি হইল, এই গুপ্ত রহস্য ব্যতীত আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে এবং হুযূরের হাদীস পড়ার বরকতে এবং উহা আমল করার কারণে অন্যান্য গুপ্ত রহস্যও আল্লাহ্‌ওয়ালাদের অন্তরে প্রতিফলিত হয়। ভালরূপে বুঝিয়া লও

এবং আমল কর। আমল না করিয়া শুধু পড়িলে বেশী ফায়দা হয় না পড়িয়া তদনুযায়ী আমল করিলে আসল ফায়দা হাছিল হয়।)

২৯। হাদীস শরীফে আছে, রাত্রের নামায অর্থাৎ, তাহাজ্জুদ এক রাকা'আত হইলেও নিজের উপর লাযেম করিয়া লও। সারকথা, তাহাজ্জুদের নামায অল্পই হউক না কেন অবশ্যই পড়। কেননা, উহার সওয়াব অনেক বেশী যদিও ফরয নহে। উদ্দেশ্য এই নহে যে, মাত্র এক রাকা-'আতই পড়। কারণ, এক রাকা'আত নামায পড়া দুরুস্ত নহে। কমপক্ষে দুই রাকা'আত পড়িবে।

৩০। হাদীসঃ নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন, তোমরা অবশ্য রাত্রি জাগিয়া এবাদত করিবে অর্থাৎ, তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে। কেননা, তোমাদের পূর্বকালের সমস্ত নেক লোকেরই এই অভ্যাস ছিল। এই নামাযের দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হয়, গোনাহ্ মা'ফ হয়, গোনাহ্‌র কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকা যায়—সয়ূতী। ঈমাম আবূ হানীফা(রঃ) ৪০ বৎসর যাবৎ এশার ওযূ দ্বারা ফজর পড়িয়াছেন।

৩১। হাদীসে কুদ্‌সীতে আছে, আল্লাহ্ বলেন, হে মানুষ! তুমি দিনের প্রারম্ভে আমার জন্য চারি রাকা'আত নামায পড়িলে তোমার সারা দিনের কাজের বন্দোবস্ত আমি করিব এবং বালা-মুছীবত আমি দূর করিয়া দিব। (ইহা এশ্‌রাক নামাযের ফযীলত। দেখ! সওয়াবও পাওয়া যায় এবং আল্লাহ্ পাক যাবতীয় কাজ পূর্ণও করিয়া দেন। দ্বীন-দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ লাভ হয়। মানুষ বিপদে পড়িয়া এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে, মানুষের খোশামোদ করে। কত ভাল হইত, যদি তাহারা আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকিত এবং তাঁহার বর্ণিত ওযীফা এবং নামায পড়িত, তবে দুনিয়ার কাজও সমাধা হইত এবং সওয়াবও পাইত। অধিকন্তু মানুষের খোশামোদের লাঞ্ছনা হইতে নাজাত পাইত। কোন বুযুর্গ বলেন, প্রত্যেক কওমের একটি নির্দিষ্ট পেশা আছে। আর আমাদের পেশা তাক্‌ওয়া ও তাওয়াক্কুল। তাক্‌ওয়া ও তাওয়াক্কুল আল্লাহ্‌র হুকুম পালনকে বলে। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা ৭ম খণ্ডের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। মোটকথা, দ্বীনদারীর ওছীলায় দুনিয়ার যাবতীয় কষ্ট আপদ-বিপদও দূরীভূত হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

বেহেশ্‌তী জেওর

তৃতীয় খণ্ড

রোযা

হাদীস শরীফে রোযার অনেক সওয়াব বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট রোযার মর্তবা অতি বড়।

রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি রমযান শরীফের রোযা ঈমানের সঙ্গে শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের সওয়াব লাভের আশায় রাখিবে, তাহার পূর্ববর্তী সমস্ত (ছগীরা) গোনাহ্ মা'ফ হইয়া যাইবে।

হাদীস শরীফে আছেঃ রোযাদারের মুখের বদবু আল্লাহ্‌র নিকট মেশ্‌কের খোশবু অপেক্ষা অধিক প্রিয়। কিয়ামতের দিন রোযার অসীম সওয়াব পাইবে।

হাদীস শরীফে আছেঃ কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোক যখন হিসাব-নিকাশের কঠোরতায় আবদ্ধ থাকিবে, তখন রোযাদারের জন্য আরশের ছায়ায় দস্তরখান বিছান হইবে। তাহারা সানন্দে পানাহার করিতে থাকিবে। তখন অন্যান্য লোক আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিবে, এ কি ব্যাপার! তাহারা সানন্দে পানাহার করিতেছে, আর আমরা এখনও হিসাবের দায়ে আবদ্ধ আছি! উত্তরে বলা হইবেঃ দুনিয়াতে তোমরা সানন্দে পানাহার করিয়াছিলে, তখন তাহারা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে রোযা রাখিয়া ক্ষুৎপিপাসার যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিল।

রোযা ইসলামের বড় একটি রোকন। যে রোযা না রাখিবে, সে মহাপাপী হইবে এবং তাহার ঈমান কমজোর হইয়া যাইবে।

১। মাসআলাঃ রমযান শরীফের রোযা পাগল ও না-বালেগ ব্যতীত (স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, অন্ধ, বধির, শ্রমিক) সকলের উপর ফরয। শরীঅতে বর্ণিত ওযর ব্যতীত রমযান শরীফের রোযা না রাখা কাহারও জন্য দুরুস্ত নহে। এইরূপে যদি কেহ রোযার মান্নত মানে, তবে সে রোযাও তাহার উপর ফরয হইয়া যায়, ক্বাযা ও কাফ্‌ফারার রোযাও ফরয। এতদ্ব্যতীত অন্য যত রোযা আছে, তাহা নফল। নফল রোযা রাখাতে সওয়াব আছে, কিন্তু না রাখিলে গোনাহ্ নাই। দুই ঈদের দুই দিন এবং বক্‌রা ঈদের পরে তিন দিন এই পাঁচ দিন রোযা রাখা হারাম।

২। মাসআলাঃ ছোব্‌হে ছাদেক হইতে সূর্যাস্ত রোযার নিয়্যতে পানাহার ও সহবাস হইতে বিরত থাকাকে শরীঅতের ভাষায় 'রোযা' বলে।

৩। মাসআলাঃ রোযার জন্য যেমন পান ও আহার পরিত্যাগ করা ফরয, তেমনই নিয়্যত করাও ফরয; কিন্তু নিয়্যত মুখে পড়া ফরয নহে, শুধু যদি মনে মনে চিন্তা করিয়া সঙ্কল্প করে যে, আমি আজ আল্লাহ্‌র নামে রোযা রাখিব এবং কিছু পানাহার বা স্ত্রী ব্যবহার করিব না, তবে

তাহাতেই রোযা হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি কেহ মনের চিন্তা এবং সঙ্কল্পের সঙ্গে মুখে ও বাংলায় বা আরবীতে নিয়্যত পড়িয়া লয় যে, 'আমি আল্লাহ্‌র নামে রোযা রাখার নিয়্যত করিতেছি' তবে তাহাও ভাল।

৪। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ সারা দিন কিছু পানাহার না করে—হয়ত ক্ষুধাই লাগে নাই, বা অন্য কোন কারণে খাওয়ার সুযোগ হয় নাই, তাহার রোযা হইবে না; অবশ্য যদি রোযা রাখার ধারণা হইত, তবে রোযা হইয়া যাইত।

৫। **মাসআলা ঃ** শরীঅত অনুসারে ছোব্‌হে ছাদেক হইতে রোযা শুরু হয়, কাজেই ছোব্‌হে ছাদেক না হওয়া পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রী ব্যবহার ইত্যাদি সব জায়েয আছে। অনেকে শেষরাত্রে সেহরী খাওয়ার পর এবং রোযার নিয়্যত করিয়া লওয়ার পর রাত্রি থাকা সত্ত্বেও কিছু খাওয়া দাওয়া বা স্ত্রী ব্যবহার করাকে না-জায়েয মনে করে, তাহা ভুল। ছোব্‌হে ছাদেক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সব জায়েয আছে, নিয়্যত করুক বা না করুক। তবে ছোব্‌হে ছাদেক হইয়া যাওয়ার সন্দেহ হইলে এইসব না করাই উচিত।

রমযান শরীফের রোযা

১। **মাসআল ঃ** যদি রাত্র হইতে রমযানের রোযার নিয়্যত করে, তবুও ফরয আদায় হইয়া যায়। যদি রাত্রে রোযা রাখার নিয়্যত ছিল না বরং ভোর হইয়া গেল, তবুও এই খেয়ালেই রহিল যে, আজ রোযা রাখিব না। অতঃপর বেলা বাড়িলে খেয়াল হইলে যে, ফরয রোযা ছাড়িয়া দেওয়া অন্যায়। তাই এখন রোযার নিয়্যত করিল, তবুও রোযা হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি সকালে কিছু পানাহার করিয়া থাকে, তবে এখন আর নিয়্যত করিতে পারে না।

২। **মাসআল ঃ** যদি কিছু পানাহার না করিয়া থাকে, তবে দিনের দ্বীপ্রহরের ১ ঘন্টা আগে পর্যন্ত রমযানের রোযার নিয়্যত করা দুরুস্ত আছে।

৩। **মাসআল ঃ** রমযান শরীফে যদি খাছ করিয়া রমযান শরীফের রোযা বা ফরয রোযা বলিয়া নিয়্যত না-ও করে, শুধু এতটুকু নিয়্যত করে যে, আজ আমি রোযা রাখিব, অথবা রাত্রে মনে মনে বলে যে, আগামীকাল আমি রোযা রাখিব, তবে তাহাতেই রমযানের রোযা ছহীহ্ হইয়া যাইবে।

৪। **মাসআল ঃ** যদি কেহ রমযান শরীফে রমযানের রোযা না রাখিয়া নফল রোযা রাখার নিয়্যত করে এবং মনে করে যে, নফল রোযা এখন রাখিয়া লই, রমযানের রোযা পরে ক্বাযা করিয়া লইব, তবুও তাহার রমযানের ফরয রোযা আদায় হইয়া যাইবে, নফল হইবে না।

৫। **মাসআল ঃ** গত রমযানের রোযা কোন কারণে ছুটিয়া গিয়াছিল, সারা বৎসরে ক্বাযা রোযা রাখে নাই, এখন রমযানের মাস আসিয়া পড়িয়াছে; যদি এই রমযানে গত রমযানের ক্বাযা রোযার নিয়্যত করে; তবুও এই রমযানের রোযাই হইবে, গত রমযানের ক্বাযা রোযা হইবে না, সে রোযা রমযানের পর ক্বাযা করিবে।

৬। **মাসআল ঃ** কেহ নযর (মান্নত) মানিয়াছিল যে, আমার অমুক কাজ হইয়া গেলে আমি আল্লাহ্‌র নামে দুইটি বা একটি রোযা থাকিব, তারপর তাহার সে মকছুদও পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু মান্নতের রোযা রাখে নাই। যখন রমযান আসিয়াছে, তখন ঐ রোযা রাখিতে ইচ্ছা করিল। তখন যদি মান্নতের রোযার নিয়্যত করে, রমযানের রোযার নিয়্যত না করে, তবুও রমযানের রোযাই

আদায় হইবে, মান্নতের রোযা আদায় হইবে না, মান্নতের রোযা রমযানের পর রাখিতে হইবে। ফলকথা, রমযান মাসে যে কোন রোযারই নিয়্যত করুক না কেন, তাহা রমযানের রোযাই হইবে, রমযান মাসে অন্য কোন রোযা ছহীহ্ হইবে না।

ইয়াওমুশ্‌শক (সন্দেহের দিন)

৭। **মাসআলা ঃ** (শা'বানের ২৯শে তারিখে সন্ধ্যার সময় যদি রমযানের চাঁদ দেখা যায়, তবে পর দিন রোযা রাখিতে হইবে।) যদি আকাশে মেঘ থাকে এবং চাঁদ দেখা না যায়, তবে পর দিন রোযা রাখিবে না। হাদীস শরীফে ইয়াওমুশ্‌শক অর্থাৎ, এইরূপ সন্দেহের দিনে রোযা রাখার নিষেধ আসিয়াছে। শা'বানের ৩০ দিন পুরা হইলে পর রোযা রাখিবে।

৮। **মাসআল ঃ** ২৯শে শা'বান মেঘের কারণে যদি চাঁদ দেখা না যায়, তবে পর দিন নফল রোযা রাখাও নিষেধ। অবশ্য যদি কাহারও হামেশা বৃহস্পতিবার, শুক্রবার অথবা অন্য কোন নির্দিষ্ট দিনে নফল রোযা রাখার অভ্যাস থাকিয়া থাকে এবং ঘটনাক্রমে ঐ তারিখ ঐ দিন হয়, তবে নফলের নিয়্যতে রোযা রাখা ভাল। অবশ্য যদি পরে কোথাও হইতে খবর আসে যে, ঐ দিন রমযানের ১লা তারিখ প্রমাণিত হইয়াছে, তবে ঐ নফলের দ্বারাই ফরয রোযা আদায় হইয়া যাইবে, ক্বাযা করিতে হইবে না

৯। **মাসআলা ঃ** মেঘের কারণে যদি ২৯ তারিখে রমযানের চাঁদ দেখা না যায়, তবে দুপুরের ১ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত কিছুই পানাহার করিবে না। যদি কোথাও হইতে চাঁদের খবর আসে, তবে তখনই রোযার নিয়্যত করিবে, আর যদি খবর পাওয়া না যায়, তবে পানাহার করিবে।

১০। **মাসআলা ঃ** ২৯শে শা'বান সন্ধ্যায় যদি চাঁদ দেখা না যায়, তবে পর দিন ক্বাযা রোযা, মান্নতের রোযা, কাফ্‌ফারার রোযা কোন রোযাই দুরুস্ত নহে, মকরূহ। অবশ্য দুরুস্ত না হওয়া সত্ত্বেও যদি কেহ রাখে, পরে ঐদিন রমাযানের ১লা তারিখ বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে ঐ রোযাতেই রমযানের রোযা আদায় হইয়া যাইবে। ক্বাযা, কাফ্‌ফারা অথবা মান্নতের রোযা পরে রাখিতে হইবে। যদি খবর না পওয়া যায়, তবে যে রোযার নিয়্যত করিয়াছে উহাই আদায় হইবে।

চাঁদ দেখা

১। **মাসআলা ঃ** আকাশে যদি মেঘ বা ধূলি থাকে, তবে মাত্র একজন পুরুষ বা স্ত্রী সত্যবাদী দ্বীনদার লোকের সাক্ষ্যতেই রমযানের চাঁদ প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হইবে।

২। **মাসআলা ঃ** ২৯শে রমযান যদি আকাশে মেঘ থাকে, তবে ঈদের চাঁদ প্রমাণিত হইবার জন্য অন্ততঃ দুইজন বিশ্বস্ত দ্বীনদার পুরুষ অথবা দ্বীনদার একজন পুরুষ এবং দ্বীনদার দুইজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য আবশ্যক, অন্যথায় ঈদের চাঁদ প্রমাণিত হইবে না। যদি একজন অতি বিশ্বস্ত, অতি ধার্মিক পুরুষেও সাক্ষ্য দেয়, অথবা শুধু চারি জন স্ত্রীলোক সাক্ষ্য দেয়, পুরুষ কেহই সাক্ষ্য না দেয়, তবে তাহাতে ঈদের চাঁদ প্রমাণিত হইবে না এবং রোযা ভাঙ্গা যাইবে না।

৩। **মাসআলা ঃ** যে লোক শরীঅতের হুকুম মত চলে না, অনবরত শরা'র বরখেলাফ কাজ করিতে থাকে; যেমন, হয়ত নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, মিথ্যা কথা বলে, (অথবা সুদ খায়) অথবা এইরূপ অন্য কোন গোনাহ্‌র কাজে লিপ্ত থাকে, শরীঅতের পাবন্দী করে না। শরীঅতে এইরূপ লোকের কথার কোনই মূল্য নাই। এই রকমের লোক যদি শত শত কসম খাইয়াও বয়ান

করে, তবুও তাহার কথা বিশ্বাস করা যাইবে না। এমন কি, যদি এই ধরনের দুই তিন জন লোকেরও বর্ণনা দেয়, তবুও তাহা দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হইবে না।

৪। **মাসআলা ঃ** মশহূর আছে, যে দিন রজব মাসের ৪ তারিখ হইবে, সেদিন রমযানের প্রথম তারিখ হইবে। শরীঅতে ইহার কোন মূল্য নাই। চাঁদ না দেখিলে রোযা রাখিবে না।

৫। **মাসআলা ঃ** হাদীস শরীফে আছে, চাঁদ দেখিয়া এইরূপ বলা যে, চাঁদ অনেক বড়। ইহা আজকার চাঁদ নয় কালকার চাঁদ, এইরূপ বলা বড়ই খারাপ। ইহা কিয়ামতের একটি আলামত। সারকথা, চাঁদ বড় ছোট হওয়ার কথার কোন মূল্য নাই। হিন্দুদের কথা বিশ্বাস করিও না যে, আজ দ্বিতীয়া, আজ অবশ্য চাঁদ উঠিবে। শরীঅতে এ সব কথার কোন মূল্য নাই।

৬। **মাসআলা ঃ** আকাশ যদি সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকে এবং তা সত্ত্বেও চাঁদ দেখা না যায়, তবে দুই চারিজনের বলাতে এবং সাক্ষ্য দেওয়াতে চাঁদ প্রমাণিত হইবে না। রমযানের চাঁদ হউক বা ঈদের চাঁদ হউক। অবশ্য যদি এত লোকে চাঁদ দেখার প্রমাণ দেয়, যাহাতে মনে দৃঢ় ধারণা হয় যে, এত লোক কিছুতেই মিথ্যা কথা বানাইয়া বলিতে পারে না, তবে চাঁদ প্রমাণিত হইয়া যাইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** অনেক সময় এরকম হয় যে, দেশ ব্যাপিয়া মশ্‌হূর হইয়া যায় যে, কাল চাঁদ দেখা গিয়াছে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত দেশ খুঁজিয়া একজনেও দেখিয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গেল না; শরীঅতে এইরূপ ভিত্তিহীন গুজবের কোনই মূল্য নাই।

৮। **মাসআলা ঃ** রমযান শরীফের চাঁদ মাত্র একজন লোকে দেখিল, অন্য কেহই দেখিল না; কিন্তু সে লোক শরীঅতের পাবন্দ না হওয়ার কারণে অন্য লোকে রোযা রাখিবে না। কিন্তু তাহার নিজের রোযা রাখিতে হইবে। কিন্তু যদি এই লোকের প্রমাণের হিসাবে ৩০ রোযা হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও ঈদের চাঁদ দেখা না যায়, তবে তাহার ৩১ রোযা রাখা ওয়াজিব হইবে, ঈদ তাহাকে সকলের সঙ্গেই করিতে হইবে।

৯। **মাসআলা ঃ** ঈদের চাঁদ যদি কেহ একা একা দেখে, অন্য কেহ না দেখে, তবে অন্যেরা ত তাহার কথা গ্রহণ করিবেই না, সে নিজেরও একা ঈদ করা দুরুস্ত নাই। পরদিন তাহারও রোযা রাখিতে হইবে, রোযা ভাঙ্গিতে পারিবে না।

১০। **মাসআলা ঃ** ৩০শে রমযান যদি দিনের বেলায় চাঁদ দেখা যায়, দুপুরের পরে দেখা যাউক বা পূর্বে দেখা যাউক, কিছুতেই রোযা ভাঙ্গা যাইবে না, সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা রাখিতে হইবে, সূর্যাস্তের পর নিয়ম মত ইফ্‌তার করিতে হইবে, ঐ চাঁদকে সামনের রাত্রের চাঁদ ধরিতে হইবে। গত রাত্রের ধরা যাইবে না। যদি কেহ দিনের বেলায় চাঁদ দেখিয়া রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলে, তবে তাহার কাফ্‌ফারা দিতে হইবে। —বেঃ গাওহার

ক্বাযা রোযা

১। **মাসআলা ঃ** কোন কারণবশতঃ যদি রমযানের সব রোযা বা কতেক রোযা রাখিতে না পারে, রমযানের পর যত শীঘ্র সম্ভব হয় ঐ সব রোযার ক্বাযা রাখিতে হইবে, দেরী করিবে না (হায়াত মউতের বিশ্বাস নাই,) বিনা কারণে ক্বাযা রোযা রাখিতে দেরী করিলে গোনাহ্‌গার হইবে।

২। **মাসআলা ঃ** ক্বাযা রোযা রাখিবার সময় দিন তারিখ নির্দিষ্ট করিবে যে, 'অমুক দিনের অমুক তারিখের রোযার ক্বাযা করিতেছি। অবশ্য এরূপ নিয়্যত করা জরুরী নহে। শুধু যে কয়টি রোযা ক্বাযা হইয়াছে, সে কয়টি রাখিলেই যথেষ্ট হইবে। অবশ্য যদি ঘটনাক্রমে দুই রমযানের

ক্বাযা রোযা একত্র হইয়া যায়, তবে এই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করিয়া নিয়্যত করিতে হইবে যে, "আজ অমুক বৎসরের রমযানের রোযা আদায় করিতেছি।"

৩। **মাসআলা ঃ** ক্বাযা রোযার জন্য রাত্রেই নিয়্যত করা যরূরী (শর্ত)। ছোব্‌হে ছাদেকের পরে ক্বাযা রোযার নিয়্যত করিলে ক্বাযা ছহীহ্ হইবে না, রোযা রাখিলে সে রোযা নফল হইবে। ক্বাযা রোযা পুনরায় রাখিতে হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** কাফ্‌ফারার রোযারও একই হুকুম; যদি ছোব্‌হে ছাদেকের পূর্বে রাত্রেই কাফ্‌ফারার বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া নিয়্যত না করে, তবে কাফ্‌ফারার রোযা ছহীহ্ হইবে না; (সেই রোযা নফল হইয়া যাইবে, কাফ্‌ফারার রোযা পুনরায় রাখিতে হইবে।)

৫। **মাসআলা ঃ** যে কয়টি রোযা ছুটিয়া গিয়াছে, তাহা সব একাধারে বা বিভিন্ন সময়ে রাখাও দুরুস্ত আছে। (একাধারে রাখা মোস্তাহাব।)

৬। **মাসআলা ঃ** গত রমযানের কিছু রোযা ক্বাযা ছিল, তাহা ক্বাযা না করিতেই পুনরায় রমযান আসিয়া গেল, এখন রমযানের রোযাই রাখিতে হইবে, ক্বাযা রোযা পরে রাখিবে। এরূপ দেরী করা ভাল নহে।

৭। **মাসআলা ঃ** রমযান শরীফের সময় দিনের বেলায় যদি কেহ বেহুঁশ হইয়া পড়ে এবং কয়েকদিন যাবৎ বেহুঁশই থাকে, তবে যদি কোন ঔষধ ইত্যাদি হল্‌কুমের নীচে না যাইয়া থাকে, তবে বেহুঁশীর প্রথম দিনের রোযার নিয়ত পাওয়া গিয়াছে, কাজেই প্রথম দিনের রোযা ছহীহ্ হইয়া যাইবে, পরে যে কয়দিন বেহুঁশ রহিয়াছে, সে কয়দিনের নিয়্যত পাওয়া যায় নাই বলিয়া কিছু পানাহার না হওয়া সত্ত্বেও সে কয়দিনের রোযা হইবে না, সে কয়দিনের রোযার ক্বাযা করিতে হইবে।

৮। **মাসআলা ঃ** এইরূপে যদি রাত্রে বেহুঁশ হয়, তবুও প্রথম দিনের রোযার ক্বাযা করা লাগিবে না। বেহুঁশীর অন্যান্য দিনের ক্বাযা ওয়াজিব হইবে। অবশ্য যদি পরদিন রোযা রাখার নিয়্যত না করিয়া থাকে, অথবা কোন ঔষধাদি সকাল বেলায় হলকুমের নীচে যাইয়া থাকে, তবে ঐ দিনেরও ক্বাযা রাখিতে হইবে।

৯। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ সমস্ত রমযান মাস ব্যাপিয়া বেহুঁশ অবস্থায় থাকে, তবে সুস্থ হওয়ার পর সমস্ত রমযান মাসের রোযা ক্বাযা করিতে হইবে। ইহা মনে করিবে না যে, বেহুঁশ থাকার কারণে রোযা একেবারে মা'ফ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য যদি কেহ সমস্ত রমযান মাস ব্যাপিয়া পাগল থাকে, মাত্রই ভাল না হয়, তবে তাহার রমযানের রোযার ক্বাযা করা লাগিবে না; কিন্তু যদি রমযানের মধ্যে ভাল হয়, তবে যে দিন হইতে ভাল হইয়াছে সে দিন হইতে রীতিমত রোযা রাখিবে।

মান্নতের রোযা

১। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ কোন ইবাদতের (অর্থাৎ, নামায, রোযা ছদ্‌কা ইত্যাদির) মান্নত করে, তবে তাহা পুরা করা ওয়াজিব হইয়া যাইবে। যদি না করে, তবে গোনাহ্‌গার হইবে।

২। **মাসআলা ঃ** মান্নত দুই প্রকার। **প্রথম**—দিন তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া মান্নত করা। **দ্বিতীয়**—অনির্দিষ্টরূপে মান্নত করা। ইহার প্রত্যেকটি আবার দুই প্রকার (১)—শর্ত করিয়া মান্নত করা। যেমন বলিল, যদি আমার অমুক কাজ সিদ্ধ হয়, তবে আমি ৫০·০০ টাকা আল্লাহ্‌র রাস্তায়

দান করিব। (২)—বিনা শর্তে শুধু আল্লাহ্‌র নামে মান্নত করা। যেমন বলিল, আমি আল্লাহ্‌র নামে পাঁচটি রোযা রাখিব। মোটকথা, যেরূপই মান্নত করুক না কেন, নির্দিষ্ট হউক বা অনির্দিষ্ট হউক, শর্তসহ হউক বা বিনাশর্তে হউক আল্লাহ্‌র নাম উল্লেখ করিয়া যবানে মান্নত করিলেই তাহা ওয়াজিব হইয়া যাইবে। (অবশ্য শর্ত করিয়া মান্নত করিলে যদি সেই শর্ত পাওয়া যায়, তবে ওয়াজিব হইবে; অন্যথায় ওয়াজিব হইবে না।)

(মাসআলা ঃ যদি কেহ বলে, আয় আল্লাহ্! আজ যদি আমার অমুক কাজ হইয়া যায়, তবে কালই আমি আপনার নামে একটি রোযা রাখিব, অথবা বলে, হে খোদা! আমার অমুক মকছুদ পূর্ণ হইলে পরশু শুক্রবার আমি আপনার নামে একটি রোযা রাখিব। এরূপ মান্নতে যদি রাত্রে রোযার নিয়্যত করে, তবুও দুরুস্ত আছে। আর যদি রাত্রে না করিয়া দ্বিপ্রহরের এক ঘণ্টা পূর্বে নিয়্যত করে, তাহাও দুরুস্ত আছে এবং মান্নত আদায় হইয়া যাইবে।)

৩। **মাসআলা ঃ** মান্নত করিয়া যে জুমু'আর দিন নির্দিষ্ট করিয়াছে, সেই জুমু'আর দিন রোযা রাখিলে যদি মান্নতের রোযা বলিয়া নিয়্যত না করে, শুধু রোযা রাখার নিয়্যত করে, অথবা নফল রোযা রাখার নিয়্যত করে, তবুও নির্দিষ্ট মান্নতের রোযা আদায় হইয়া যাইবে। অবশ্য যদি ঐ তারিখে ক্বাযা রোযা রাখার নিয়্যত করে এবং মান্নতের রোযার কথা মনে না থাকে, অথবা মনে ছিল কিন্তু ইচ্ছা করিয়া ক্বাযা রোযা রাখিয়াছে, তবে ক্বাযা রোযাই আদায় হইবে, মান্নত আদায় হইবে না; মান্নতের রোযা অন্য আর একদিন ক্বাযা করিতে হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** দ্বিতীয় মান্নত এই যে, যদি দিন তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া মান্নত না করে, শুধু বলে যে, যদি আমার অমুক কাজ হইয়া যায়, আমি আল্লাহ্‌র নামে পাঁচটি রোযা রাখিব, অথবা শর্ত না করিয়া শুধু বলে, আমি আল্লাহ্‌র নামে পাঁচটি রোযা রাখিব, তবুও পাঁচটি রোযা রাখা ওয়াজিব হইবে; কিন্তু যেহেতু কোন দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে নাই, কাজেই যে কোন দিন রাখিতে পারিবে কিন্তু নিয়্যত রাত্রেই করা শর্ত। ছোব্‌হে ছাদেকের পরে মান্নতের রোযার নিয়্যত করিলে এইরূপ অনির্দিষ্ট মান্নতের রোযা আদায় হইবে না এবং এই রোযা নফল হইয়া যাইবে।

নফল রোযা

১। **মাসআলা ঃ** নফল রোযার জন্য যদি এই নিয়্যত করে যে, 'আল্লাহ্‌র নামে একটি নফল রোযা রাখিব', তাহাও দুরুস্ত আছে এবং যদি শুধু এইরূপ নিয়্যত করে যে, 'আমি আল্লাহ্‌র নামে একটি রোযা রাখিব' তাহাও দুরুস্ত আছে।

২। **মাসআলা ঃ** বেলা দ্বিপ্রহরের এক ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত নফল রোযার নিয়্যত করা দুরুস্ত আছে। অতএব, যদি কাহারও বেলা ১০টা পর্যন্তও রোযা রাখার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এখনও কিছু পানাহার করে নাই, তারপর রোযা রাখার ইচ্ছা হইল, তবে ঐ সময় রোযার নিয়্যত করিলেও নফল রোযা দুরুস্ত হইয়া যাইবে।

৩। **মাসআলা ঃ** সারা বৎসরে মাত্র পাঁচ দিন রোযা রাখা দুরুস্ত নহে। দুই ঈদের দুই দিন এবং বক্‌রা ঈদের পরে ১১ই, ১২ই, এবং ১৩ই যিলহজ্জ, মোট এই পাঁচ দিন রোযা রাখা হারাম, তাহা ছাড়া নফল রোযা যে কোন দিন রাখা যায় এবং নফল রোযা যত বেশী রাখা যাইবে তত বেশী সওয়াব পাওয়া যাইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ ঈদের দিন রোযা রাখার মান্নত করে, তবুও ঈদের দিন রোযা দুরুস্ত নহে। তৎপরিবর্তে অন্য একদিন রোযা রাখিয়া মান্নত পুরা করিতে হইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ এইরূপ মান্নত করে যে, 'আমি সারা বৎসর রোযা রাখিব, এক দিনেরও রোযা ছাড়িব না,' তবুও এই পাঁচ দিন রোযা রাখিবে না। এই পাঁচ দিন রোযা না রাখিয়া তাহার পরিবর্তে অন্য পাঁচ দিন রোযা রাখিতে হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** নফল রোযার নিয়্যত করিয়া লইলে সে রোযা পুরা করা ওয়াজিব হইয়া যায়। অতএব, যদি কেহ সকালে নফল রোযার নিয়ত করিয়া পরে ঐ রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলে, তবে তাহার ঐ রোযার ক্বাযা করা ওয়াজিব হইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** কেহ রাত্রে রোযা রাখার ইচ্ছা করিয়াছিল, 'আমি আগামীকাল রোযা রাখিব', কিন্তু ছোব্‌হে ছাদেক হওয়ার পূর্বেই নিয়্যত বদলিয়া গেল এবং রোযা রাখিল না, তবে তাহার ক্বাযা ওয়াজিব হইবে না। (কিন্তু ছোব্‌হে ছাদেক হওয়ার পর যদি বদলায়, তবে ক্বাযা ওয়াজিব হইবে।)

৮। **মাসআলা ঃ** স্ত্রীর জন্য স্বামী বাড়ীতে থাকিলে স্বামীর বিনা অনুমতিতে নফল রোযা রাখা দুরুস্ত নহে। এমন কি, যদি স্বামীর বিনা অনুমতিতে নফল রোযার নিয়্যত করে এবং পরে স্বামী রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলার আদেশ করে, তবে রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলা দুরুস্ত আছে, কিন্তু পরে স্বামীর অনুমতি লইয়া তাহার ক্বাযা করিতে হইবে।

৯। **মাসআলা ঃ** মেহ্‌মান বা মেযবান (মেহ্‌মান অতিথি, মেযবান বাড়ীওয়ালা) যদি একে অন্যের সঙ্গে না খাওয়াতে মনে কষ্ট পায়, তবে নফল রোযা ছাড়িয়া দেওয়া দুরুস্ত আছে, কিন্তু ঐ রোযার পরিবর্তে আর একটি রোযা রাখিতে হইবে।

১০। **মাসআলা ঃ** কেহ ঈদের দিন নফল রোযা রাখিল এবং নিয়্যতও করিল, তবুও সেই রোযা ছাড়িয়া দিবে, উহার ক্বাযা করাও ওয়াজিব হইবে না।

১১। **মাসআলা ঃ** মহর্‌রম মাসের ১০ই তারিখ রোযা রাখা মুস্তাহাব। হাদীস শরীফে আছে, যে কেহ মহর্‌রম মাসের ১০ই তারিখে একটি রোযা রাখিবে তাহার বিগত এক বৎসরের (ছগীরা) গোনাহ্‌ মা'ফ হইয়া যাইবে (কিন্তু শুধু ১০ই তারিখে একটি রোযা মকরূহ্‌। কাজেই তাহার সঙ্গে ৯ই তারিখে অথবা ১১ই তারিখে রোযা রাখিবে।)

১২। **মাসআলা ঃ** এইরূপ হজ্জের চাঁদের ৯ই তারিখে রোযা রাখাও বড় সওয়াব। (হাদীস শরীফে আছে,) যে ব্যক্তি হজ্জের চাঁদের ৯ই তারিখে এই রোযা রাখিবে, তাহার বিগত এবং আগামী বৎসরের (ছগীরা) গোনাহ্‌ মা'ফ হইয়া যাইবে। (মহর্‌রমের আশুরার তারিখে একটি রোযা মকরূহ্‌, কিন্তু এখানে একটি রোযা রাখা মকরূহ্‌ নহে।) তবে শুরু চাঁদ হইতে ৯ই যিলহজ্জ পর্যন্ত রোযা রাখা উত্তম। (এইরূপে মহর্‌রমের চাঁদের শুরু হইতে ১০টি রোযা রাখা অতি উত্তম।)

১৩। **মাসআলা ঃ** শা'বানের চাঁদের ১৫ ই তারিখে রোযা রাখা এবং শাওয়ালের চাঁদের ঈদের দিন বাদ দিয়া ছয়টি রোযা রাখা অন্যান্য নফল রোযা অপেক্ষা অধিক সওয়াব (রজবের চাঁদে ২৭শে তারিখে রোযা রাখাও মুস্তাহাব।)

১৪। **মাসআলা ঃ** যে ব্যক্তি প্রত্যেক চাঁদের ১৩ই, ১৪ই এবং ১৫ই তারিখে আইয়্যামে বীযের তিনটি রোযা রাখিল, সে যেন সারা বৎসর রোযা রাখিল। হযরত নবী আলাইহিস্‌সালাম এই

তিনটি রোযা রাখিতেন এবং প্রত্যেক সোমবার এবং বৃহস্পতিবারেও রোযা রাখিতেন। যদি কেহ এইসব রোযা রাখে, তবে তাহাতে অনেক সওয়াব আছে। (না রাখিলে কোন গোনাহ্ নাই।)

যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় বা হয় না

১। **মাসআলা ঃ** রোযা রাখিয়া যদি রোযার কথা ভুলিয়া কিছু খাইয়া ফেলে, কিংবা ভুলে স্বামী-সহবাস হইয়া যায়, রোযার কথা মাত্রই মনে না আসে, তবে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হয় না। যদি ভুলে পেট ভরিয়াও পানাহার করে, কিংবা ভুলে কয়েক বার পানাহার করে, তবুও রোযা ভঙ্গ হয় না। (কিন্তু খাওয়া শুরু করার পর স্মরণ হইলে তৎক্ষণাৎ খাওয়া বন্ধ করিতে হইবে। কিছু জিনিস গিলিয়া ফেলিলেও রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে।)

২। **মাসআলা ঃ** কোন রোযাদারকে ভুলবশতঃ খাইতে দেখিলে যদি রোযাদার সবল হয় এবং রোযা রাখিতে কষ্ট না হয়, তবে তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া ওয়াজিব। কিন্তু যদি রোযা রাখিবার মত শক্তি তাহার না থাকে, তবে স্মরণ করাইবে না; তাহাকে খাইতে দিবে।

৩। **মাসআলা ঃ** রোযা রাখিয়া দিনে ঘুমাইলে ও স্বপ্নদোষ হইলে (বা স্বপ্নে কিছু খাইলে) রোযা ভঙ্গ হয় না।

৪। **মাসআলা ঃ** রোযা রাখিয়া সুরমা বা তেল লাগান অথবা খুশ্‌বুর ঘ্রাণ লওয়া দুরুস্ত আছে। এমন কি, চোখে সুরমা লাগাইলে যদি থুথু কিংবা শ্লেষ্মায় সুরমার রং দেখা যায়, তবুও রোযা ভঙ্গ হয় না, মকরূহ্‌ও হয় না।

৫। **মাসআলা ঃ** রোযা রাখিয়া দিনের বেলায় স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে শোয়া হাত লাগান বা পেয়ার করা সমস্তই দুরুস্ত, কিন্তু যদি কামভাব প্রবল হইয়া স্ত্রীসহবাসের আশংকা হয়, তবে এরূপ করা মকরূহ্। (এই জন্যই জওয়ান স্বামী-স্ত্রীর জন্য রোযা রাখিয়া চুম্বন অথবা কোলাকুলি করা মকরূহ্। কিন্তু যে সব বৃদ্ধের মনে চাঞ্চল্য আসে না তাহাদের জন্য মকরূহ্ নহে।)

৬। **মাসআলা ঃ** আপনাআপনি যদি হল্‌কুমের মধ্যে মাছি, ধোঁয়া বা ধুলা চলিয়া যায়, তবে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হয় না; কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক এরূপ করিলে রোযা ভঙ্গ হইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** লোবান বা আগরবাতি জ্বালাইয়া তাহার ধোঁয়া গ্রহণ করিলে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। এইরূপে যদি কেহ বিড়ি সিগারেট অথবা হুক্কার ধোঁয়া পান করে তবে তাহার রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। কিন্তু গোলাপ, কেওড়া ফুল, আতর ইত্যাদি যে সব খোশবুতে ধোঁয়া নাই, তাহার ঘ্রাণ লওয়া দুরুস্ত আছে।

৮। **মাসআলা ঃ** দাঁতের ফাঁকে যদি কোন খাদ্যদ্রব্য আট্‌কিয়া থাকে এবং খেলাল বা জিহ্বার দ্বারা তাহা বাহির করিয়া গিলিয়া ফেলে, মুখের বাহির না করে এবং ঐ খাদ্যদ্রব্য একটি বুটের পরিমাণ অথবা তদপেক্ষা অধিক হয়, তবে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। আর যদি একটি বুট অপেক্ষা কম হয়, তবে রোযা ভঙ্গ হইবে না; কিন্তু যদি মুখ হইতে বাহিরে আনিয়া তারপর গিলে, তবে তাহা একটি বুট হইতে কম হইলেও রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

৯। **মাসআলা ঃ** মুখের থুথু যত বেশীই হউক না কেন তাহা গিলিলে রোযার কোনই ক্ষতি হয় না।

১০। **মাসআলা ঃ** শেষ রাত্রে সেহ্‌রী খাওয়ার পর যদি কেহ পান খায়, তবে ছোব্‌হে ছাদেকের পূর্বেই উত্তমরূপে কুল্লি করিয়া মুখ ছাফ করিয়া লওয়া উচিত। উত্তমরূপে কুল্লি করার পরও যদি

সকালে থুথু কিছু লাল দেখায়, তবে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে না। (রোযা অবস্থায় ইন্‌জেকশন নিলেও রোযা নষ্ট হয় না।)

১১। মাসআলা ঃ রাত্রে যদি গোসল ফরয হয়, তবে ছোব্‌হে ছাদেকের পূর্বেই গোসল করিয়া লওয়া উচিত; কিন্তু যদি কেহ গোসল করিতে দেরী করে, কিংবা সারাদিন গোসল নাও করে, তবে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে না। অবশ্য ফরয গোসল অকারণে দেরীতে করিলে তজ্জন্য পৃথক গোনাহ্ হইবে।

১২। মাসআলা ঃ নাকের শ্লেষ্মা জোরে টানার কারণে যদি হলকুমে চলিয়া যায়, তবে তাহাতে রোযা নষ্ট হয় না। এইরূপে মুখের লালা টানিয়া গিলিলেও রোযা নষ্ট হয় না।

১৩। মাসআলা ঃ যদি কেহ সেহ্‌রী খাইয়া পান মুখে দিয়া চিবাইতে চিবাইতে ঘুমাইয়া পড়ে এবং পান মুখে থাকা অবস্থাতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া যায়, তবে তাহার রোযা শুদ্ধ হইবে না। এই রোযা ভাঙ্গিতে পারিবে না বটে, কিন্তু উহার পরিবর্তে একটি রোযা ক্বাযা রাখিতে হইবে, কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হইবে না।

১৪। মাসআলা ঃ কুল্লি করার সময় যদি (অসতর্কতাবশতঃ রোযার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও) হলকুমের মধ্যে পানি চলিয়া যায়, (অথবা ডুব দিয়া গোসল করিবার সময় হঠাৎ নাক বা মুখ দিয়া পানি হলকুমের ভিতর চলিয়া যায়,) তবে রোযা ভঙ্গ হইবে। (কিন্তু পানাহার করিতে পারিবে না।) এই রোযা ক্বাযা করা ওয়াজিব, কাফ্‌ফারা ওয়াজিব নহে।

১৫। মাসআলা ঃ আপনাআপনি যদি বমি হইয়া যায়, তবে বেশী হউক কি কম হউক, তাহাতে রোযা নষ্ট হয় না। কিন্তু যদি ইচ্ছা করিয়া মুখ ভরিয়া বমি করে, তবে রোযা নষ্ট হইয়া যায়, অল্প বমি করিলে রোযা নষ্ট হয় না।

১৬। মাসআলা ঃ যদি আপনাআপনিই সামান্য বমি হয় এবং আপনাআপনিই হলকুমের ভিতর চলিয়া যায়, তাহাতে রোযা নষ্ট হইবে না। অবশ্য যদি ইচ্ছাপূর্বক গিলে, তবে কম হইলেও রোযা নষ্ট হইয়া যাইবে, (অথবা যদি বেশী পরিমাণ আপনাআপনিই হলকুমের নীচে চলিয়া যায়, তবে রোযা নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু পানাহার করিবে না।)

১৭। মাসআলা ঃ যদি কেহ একটি কঙ্কর অথবা একটি লোহার (বা সীসার) গুলি (অথবা একটি পয়সা গিলিয়া ফেলে অর্থাৎ,) এমন কোন জিনিস গিলিয়া ফেলে যাহা লোকে সাধারণতঃ খাদ্যরূপেও খায় না বা ঔষধরূপেও সেবন করে না, তবে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে বটে, কিন্তু কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না; শুধু একটি রোযার পরিবর্তে একটি রোযা ক্বাযা করিতে হইবে। আর যদি এমন কোন জিনিস গিলিয়া ফেলে, যাহা লোকে খাদ্যরূপে খায়, অথবা পানীয়রূপে পান করে, বা ঔষধরূপে সেবন করে, তবে তাহাকে ক্বাযাও রাখিতে হইবে এবং কাফ্‌ফারাও দিতে হইবে।

১৮। মাসআলা ঃ রোযা রাখিয়া দিনের বেলায় স্ত্রী-সহবাস করিলে এমন কি পুরুষের খৎনা স্থান স্ত্রীর যোনি দ্বারে প্রবেশ করিলে বীর্যপাত হউক বা না হউক রোযা ভঙ্গ হইবে, ক্বাযা এবং কাফ্‌ফারা উভয়ই ওয়াজিব হইবে।

১৯। মাসআলা ঃ স্বামী যদি স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে পুরুষাঙ্গের খৎনাস্থান পর্যন্ত প্রবেশ করায়, তবুও উভয়ের রোযা ভঙ্গ হইবে। কাফ্‌ফারা, ক্বাযা উভয়ই ওয়াজিব হইবে।

২০। মাসআলা ঃ রমযান শরীফের রোযা রাখিয়া ভাঙ্গিলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়। রমযান ছাড়া অন্য কোন রোযা ভাঙ্গিলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না, যেরূপেই ভাঙ্গুক, যদিও রমযানের ক্বাযা রোযা রাখিয়া ভাঙ্গে। অবশ্য যদি রাত্রে রোযার নিয়্যত না করে, কিংবা রোযা ভাঙ্গার পর ঐ দিনই হায়েয আসে, তবে ঐ ভাঙ্গার কারণে কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে না।

২১। মাসআলা ঃ নাকে নস্য টানিলে বা কানে তেল ঢালিলে, অথবা পায়খানার জন্য ডুস লইলে রোযা ভঙ্গ হইয়া যায়, কিন্তু এইরূপ করিলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে না, শুধু ক্বাযা করিতে হইবে। কানে পানি টপ্কাইলে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হয় না।

২২। মাসআলা ঃ রোযা রাখা অবস্থায় পেশাবের রাস্তায় কোন ঔষধ রাখা অথবা তেল ইত্যাদি কিছু টপকান দুরুস্ত নাই। যদি কেহ ঔষধ রাখে, তবে রোযা ভঙ্গ হইবে এবং ক্বাযা ওয়াজিব হইবে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে না।

২৩। মাসআলা ঃ ধাত্রী যদি প্রসূতির প্রস্রাব দ্বারে আঙ্গুল ঢুকায় কিংবা নিজেই নিজ যোনিতে আঙ্গুল ঢুকায়, অতঃপর সম্পূর্ণ আঙ্গুল বা কিয়দংশ বাহির করার পর আবার ঢুকায়, তবে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। কিন্তু কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে না। আর যদি বাহির করার পর আবার না ঢুকায় তবে রোযা ভঙ্গ হইবে না। অবশ্য যদি পানি ইত্যাদির দ্বারা আঙ্গুল ভিজা থাকে, তবে প্রথমবারে ঢুকাইলেই রোযা ভঙ্গ হইবে।

২৪। মাসআলা ঃ দাঁত দিয়া রক্ত বাহির হইলে যদি থুথুর সঙ্গে সে রক্ত গিলিয়া ফেলে, তবে রোযা ভঙ্গ হইবে, কিন্তু যদি থুথুর চেয়ে কম হয়—যাহাতে রক্তের স্বাদ পাওয়া না যায়, তবে রোযা ভঙ্গ হইবে না।

২৫। মাসআলা ঃ কোন জিনিস জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়া শুধু একটু স্বাদ দেখিয়া থুথু ফেলিয়া দিলে, রোযা ভঙ্গ হয় না; কিন্তু বিনা দরকারে এরূপ করা মক্রূহ্। অবশ্য যদি কাহারও স্বামী এত বড় যালেম এবং পাষাণ হৃদয় হয় যে, ছালুনে নিমক একটু বেশী-কম হইলে যুলুম করা শুরু করে, তাহার জন্য ছালুনের নুন দেখিয়া থুথু ফেলিয়া দেওয়া দুরুস্ত আছে, মকরূহ্ নহে।

২৬। মাসআলা ঃ রোযাবস্থায় শিশু সন্তানের খাওয়ার জন্য কোন জিনিস চিবাইয়া দেওয়া মকরূহ্। অবশ্য শিশুর জীবন ওষ্ঠাগত হইলে এবং কেহ চিবাইয়া দেওয়ার না থাকিলে, এইরূপ অবস্থায় চিবাইয়া দিয়া মুখ পরিষ্কার করিয়া ফেলা জায়েয আছে।

২৭। মাসআলা ঃ রোযা রাখিয়া দিনের বেলায় কয়লা, বা মাজন (বা বালুর) দ্বারা দাঁত মাজা মকরূহ্ এবং ইহার কিছু অংশ যদি হলকুমের নীচে চলিয়া যায়, তবে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। কাঁচা বা শুক্না মেস্ওয়াক দ্বারা দাঁত মাজা দুরুস্ত আছে। এমন কি, যদি নিমের কাঁচা ডালের মেস্ওয়াক দ্বারা মেস্ওয়াক করে এবং তাহার তিক্ততার স্বাদ মুখে অনুভব করে, তাহাতেও রোযার কোন ক্ষতি হইবে না, মক্রূহ্ও হইবে না।

২৮। মাসআলা ঃ কোন স্ত্রীলোক অসতর্ক অবস্থায় ঘুমাইয়াছে, কিংবা অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে, কেহ তাহার সহিত সহবাস করিলে তাহার রোযা ভঙ্গ হইবে এবং ক্বাযা ওয়াজিব হইবে। কিন্তু পুরুষের কাফ্ফারাও ওয়াজিব হইবে।

২৯। মাসআলা ঃ ভুলে পানাহার করিলে রোযা যায় না, কিন্তু এইরূপ করার পর তাহার রোযা ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া যদি কিছু খায়, তবে তাহার রোযা অবশ্য ভঙ্গ হইয়া যাইবে; কিন্তু শুধু ক্বাযা করিতে হইবে, কাফ্ফারা দিতে হইবে না।

৩০। মাসআলা ঃ কাহারও যদি আপনাআপনি বমি হয়, তাহাতে রোযা ভঙ্গ হয় না, কিন্তু রোযা ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া যদি পরে কিছু খায়, তবে তাহার রোযা অবশ্য টুটিয়া যাইবে; কিন্তু শুধু ক্বাযা করিতে হইবে, কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না।

৩১। মাসআলা ঃ যদি কেহ সুরমা অথবা তেল লাগাইয়া অজ্ঞতাবশতঃ মনে করে যে, তাহার রোযা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং এই কারণে ইচ্ছা করিয়া কিছু খাওয়া-দাওয়া করে, তবে ক্বাযা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই ওয়াজিব হইবে।

৩২। মাসআলা ঃ রমযান মাসে কোন কারণবশতঃ যদি কাহারও রোযা ভাঙ্গিয়া যায়, তবুও দিনের বেলায় তাহার জন্য কিছু খাওয়-দাওয়া দুরুস্ত নহে, সমস্ত দিন রোযাদারের ন্যায় না খাইয়া থাকা তাহার উপর ওয়াজিব।

৩৩। মাসআলা ঃ যদি কেহ রমযানে রোযার নিয়্যতই করে নাই বলিয়া খাওয়া-দাওয়া করিতে থাকে, তাহার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হইবে না। রোযার নিয়্যত করিয়া ভাঙ্গিলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়।

কাফ্‌ফারা

১। মাসআলা ঃ রমযান শরীফের রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে একাধারে দুই মাস অর্থাৎ, ৬০টি রোযা রাখিতে হইবে। কিছু কিছু করিয়া রাখা দুরুস্ত নাই। একলাগা ৬০টি রোযা রাখিতে হইবে। যদি মাঝখানে ঘটনাক্রমে দুই একদিনও বাদ পড়ে, তবে তাহার পর হইতে আবার ৬০টি গণনা করিয়া পূর্ণ করিতে হইবে, পূর্বেরগুলি হিসাবে ধরা যাইবে না। এমন কি, যদি এই ৬০দিনের মধ্যে ঈদের বা কোরবানীর দিনও আসে, তবুও কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না, পূর্বগুলি বাদ দিয়া উহার পর হইতে ৬০টি পূর্ণ করিতে হইবে। অবশ্য এই ৬০ দিনের মধ্যে যদি মেয়েলোকের হায়েয আসে, তবে তাহা মা'ফ; কিন্তু হায়েয হইতে পাক হইবার পর দিন হইতেই আবার রোযা রাখিতে হইবে এবং ৬০টি রোযা পূর্ণ করিতে হইবে।

২। মাসআলা ঃ নেফাসের কারণে যদি মাঝে রোযা ভাঙ্গা পড়ে, তবে কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না। নেফাস হইতে পাক হওয়ার পর ৬০টি পূর্ণ করিবে। নেফাসের পূর্বে যদি কিছু রোযা রাখিয়া থাকে, তাহা গণনায় ধরা যাইবে না।

৩। মাসআলা ঃ রোগের কারণে যদি মাঝখানে ভাঙ্গা পড়ে, তবে রোগ আরোগ্য হওয়ার পর নূতনভাবে ৬০টি রোযা পূর্ণ করিতে হইবে।

৪। মাসআলা ঃ যদি মাঝে রমযানের মাস আসে, তবুও কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না।

৫। মাসআলা ঃ যদি কাহারও কাফ্‌ফারার রোযা রাখার শক্তি না থাকে, তবে রমযান শরীফের একটি রোযা ভাঙ্গিল তাহার পরিবর্তে ৬০ জন মিস্‌কীনকে দুই ওয়াক্ত খুব পেট ভরিয়া খাওয়াইতে হইবে।

৬। মাসআলা ঃ যদি এই ৬০ জনের মধ্যে কয়েকজন এমন অল্প বয়স্ক থাকে যে, তাহারা পূর্ণ খোরাক খাইতে পারে না, তবে তাহাদিগকে হিসাবে ধরা যাইবে না। তাহাদের পরিবর্তে অন্য পূর্ণ খোরাক খানেওয়ালা মিসকীনকে আবার খাওয়াইতে হইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** যদি গমের রুটি হয়, তবে শুধু রুটি খাওয়ানও দুরুস্ত আছে, আর যদি যব, বজরা, ভুট্টা ইত্যাদির রুটি বা ভাত হয়, তবে উহার সহিত কিছু ভাল তরকারী দেওয়া উচিত। যাহাতে রুটি, ভাত খাইতে পারে।

৮। **মাসআলা ঃ** পাকান খাদ্য না খাওয়াইয়া যদি ৬০ জন মিসকীনকে গম বা তার আটা দেয়, তাহাও জায়েয আছে। কিন্তু প্রত্যেক মিসকীনকে ছদ্‌কায়ে ফেৎর পরিমাণ দিতে হইবে। ছদ্‌কায়ে ফেৎরের বর্ণনা যাকাত অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৯। **মাসআলা ঃ** যদি এইপরিমাণ গমের দাম দেয় তাহাও জায়েয আছে।

১০। **মাসআলা ঃ** কিন্তু যদি সে তাহার কাফ্‌ফারা আদায় করিবার জন্য কাহাকেও অনুমতি দেয় বা আদেশ করে এবং তারপর সেই ব্যক্তি আদায় করিয়া দেয়, তবে তাহার কাফ্‌ফারা আদায় হইয়া যাইবে। যাহার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হইয়াছে তাহার বিনা অনুমতিতে যদি অন্য কেহ তাহার কাফ্‌ফারা আদায় করিয়া দেয়, তবে তাহাতে তাহার কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না।

১১। **মাসআলা ঃ** যদি একজন মিস্‌কীনকে ৬০ দিন সকাল বিকাল পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দেয় বা একই জনকে ৬০ দিন ৬০ বার (ছদ্‌কায়ে ফেৎর পরিমাণ) গম বা তাহার মূল্য দেয় তাহাতে কাফ্‌ফারা আদায় হইয়া যাইবে।

১২। **মাসআলা ঃ** যদি ৬০ দিন পর্যন্ত খাওয়াইবার বা মূল্য দিবার সময় মাঝখানে ২/১ দিন বাকী পড়ে, তবে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। (একাধারে ৬০ দিন না হইলেও সর্বশুদ্ধ ৬০ দিন খাওয়ান হইলে বা মূল্য দেওয়া হইলে তাহাতেই চলিবে)।

১৩। **মাসআলা ঃ** ৬০ দিনের আটা বা গম অথবা তাহার মূল্য হিসাব করিয়া একই দিন একজন মিস্‌কীনকে দেওয়া দুরুস্ত নাই। (দিলে মাত্র এক দিনের কাফ্‌ফারা আদায় হইবে, বাকী ৫৯ দিনের পুনরায় আদায় করিতে হইবে।) এইরূপে যদি এক দিন একজন মিসকীনকে ৬০ বার দেয়, তাবুও মাত্র একদিনেরই কাফ্‌ফারা আদায় হইবে, বাকী ৫৯ দিনের পুনরায় আদায় করিতে হইবে। সারকথা এই যে, একদিন একজন গরীবকে একটি রোযার বিনিময় হইতে অধিক দিলে তাহার হিসাব ধরা যাইবে না, মাত্র এক দিনেরই ধরা যাইবে।

১৪। **মাসআলা ঃ** কোন মিসকীনকে ছদ্‌কায়ে ফেৎর পরিমাণের কম দিলে কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না।

১৫। **মাসআলা ঃ** যদি একই রমযানের ২ বা ৩টি রোযা ভাঙ্গিয়া থাকে, তবে একটি কাফ্‌ফারাই ওয়াজিব হইবে। (কিন্তু যে কয়টি রোযা ভাঙ্গিয়াছে সেই কয়টির ক্বাযা করিতে হইবে। যদি দুই রমাযানের দুইটি রোযা ভাঙ্গিয়া থাকে, তবে একটি কাফ্‌ফারা যথেষ্ট হইবে না, দুইটি কাফ্‌ফারা আদায় করিতে হইবে।)

সেহ্‌রী ও ইফ্‌তার

১। **মাসআলা ঃ** রোযা রাখিবার উদ্দেশ্যে শেষ রাত যাহাকিছু খাওয়া হয়, তাহাকে সেহ্‌রী বলে। সেহ্‌রী খাওয়া সুন্নত। ক্ষুধা না থাকিলে অন্ততঃ ২/১টি খোরমা বা অন্য কোন জিনিস খাইবে। কিছু না হইলে একটু পানি পান করিবে। (ইহাতেও সুন্নত আদায় হইবে।

২। **মাসআলা ঃ** সেহ্‌রীর সময় যদি কেহ সেহ্‌রী না খাইয়া মাত্র (এক মুষ্টি চাউল পানি দিয়া খায় বা) একটি পান খায়, তাহাতেও সেহ্‌রী খাওয়ার সওয়াব হাছেল হইয়া যাইবে।

৩। **মাসআলা ঃ** সেহ্‌রী যথাসম্ভব দেরী করিয়া খাওয়া ভাল, এত দেরী করা উচিত নহে যাহাতে ছোবহে ছাদেক হইবার আশংকা হয় এবং রোযার মধ্যে সন্দেহ আসিতে পারে।

৪। **মাসআলা ঃ** যদি সেহ্‌রী খুব জল্‌দী খায়; কিন্তু তাহার পর পান তামাক, চা, পানি ইত্যাদি অনেকক্ষণ পর্যন্ত খাইতে থাকে, ছোব্‌হে ছাদেক হওয়ার অল্প পূর্বে কুল্লি করিয়া ফেলে, তবুও দেরী করিয়া খাওয়ার সওয়াব পাইবে। ইহার হুকুমও দেরী করিয়া খাওয়ার হুকুম। (সেহ্‌রী খাওয়ার আসল সময় সূর্যাস্ত হইতে ছোব্‌হে ছাদেক পর্যন্ত যে কয় ঘণ্টা হয় তাহার ছয় ভাগের শেষ ষষ্ঠ ভাগ। যদি কেহ ইহার পূর্বে ভাত ইত্যাদি খায়, কিন্তু চা, পান ইত্যাদি এই শেষ ষষ্ঠাংশে করে, তবে তাহাতেও মুস্তাহাবের সওয়াব হাছেল হইবে।)

৫। **মাসআলা ঃ** যদি রাত্রে ঘুম না ভাঙ্গে এবং সেই জন্য সেহ্‌রী খাইতে না পারে, তবে সেহ্‌রী না খাইয়া রোযা রাখিবে। সেহ্‌রী না খাওয়ার কারণে রোযা ছাড়িয়া দেওয়া বড়ই কাপুরুষতার লক্ষণ এবং বড়ই গোনাহ্‌র কাজ।

৬। **মাসআলা ঃ** যে পর্যন্ত ছোব্‌হে ছাদেক না হয় অর্থাৎ, পূর্বদিকে সাদা বর্ণ না দেখা যায়, সে পর্যন্ত সেহ্‌রী খাওয়া দুরুস্ত আছে। ছোব্‌হে ছাদেক হইয়া গেলে তারপর আর কিছুই খাওয়া-দাওয়া দুরুস্ত নহে।

৭। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ দেরীতে ঘুম হইতে উঠিয়া 'এখনও রাত আছে, ছোব্‌হে ছাদেক হয় নাই,' এই মনে করিয়া সেহ্‌রী খায়, পরে জানিতে পারে যে, ঐ সময় রাত ছিল না, তবে ঐ রোযা ছহীহ্‌ হইবে না, ঐ রোযার পরিবর্তে আর একটি রোযা ক্বাযা করিতে হইবে; কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না। কিন্তু ঐ দিনেও কিছু পানাহার করিতে পারিবে না। এইরূপে যদি সূর্য ডুবিয়া গিয়াছে, এই মনে করিয়া ইফ্‌তার করিয়া ফেলে এবং পরে জানেত পারে যে, সূর্য ডুবে নাই, তবে ঐ রোযা ছহীহ্‌ হইবে না। ঐ রোযার ক্বাযা করিতে হইবে; কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না। অবশ্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবশিষ্ট সময়টুকুতে কিছুই পানাহার করিতে পারিবে না।

৮। **মাসআলা ঃ** দেরী করিয়া উঠিয়া যদি সন্দেহ হয় যে, হয়ত ছোব্‌হে ছাদেক হইয়া গিয়াছে, তবে ঐ সময় কিছু খাওয়া-দাওয়া মাক্‌রূহ্‌। ঐরূপ সন্দেহের সময় কিছু খাইলে গোনাহ্‌গার হইবে এবং রোযার ক্বাযা করিতে হইবে। কিন্তু যদি এক্বিনীভাবে জানিতে পারে যে, ছোব্‌হে ছাদেক হয় নাই, তবে রোযার ক্বাযা করিতে হইবে না। আর যদি কিছু ঠিক করিতে না পারে সন্দেহই থাকিয়া যায়, তবে ক্বাযা ওয়াজিব নহে, কিন্তু ক্বাযা রাখা ভাল।

৯। **মাসআলা ঃ** যখন নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, সূর্য অস্ত গিয়াছে তখন আর দেরী না করিয়া শীঘ্রই ইফ্‌তার করা মুস্তাহাব। দেরী করিয়া ইফ্‌তার করা মকরূহ্‌।

১০। **মাসআলা ঃ** আবরের (মেঘের) দিনে কিছু দেরী করিয়া ইফ্‌তার করা ভাল। শুধু ঘড়ি-ঘণ্টার উপর নির্ভর করা ভাল নয়। কারণ, ঘড়ি-ঘণ্টাও প্রায় সময় ভুল হয়। অতএব, আবরের দিনে যতক্ষণ ঈমানদার ব্যক্তির দিলে সূর্য অস্ত গিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য না দেয়, ততক্ষণ ইফ্‌তার করিবে না। কাহারও আযানের উপরও পূর্ণ নির্ভর করা উচিত নহে। কারণ, মোয়ায্‌যেনেরও ভুল হইতে পারে। কাজেই ঈমানদারের দিলে গাওয়াহী না দেওয়া পর্যন্ত ছবর করাই ভাল। ওয়াক্ত হইল কি না সন্দেহ হইলে ইফ্‌তার করা দুরুস্ত নাই।

১১। মাসআলা ঃ খোরমার দ্বারা ইফ্তার করা সবচেয়ে উত্তম। খোরমার অভাবে অন্য কোন মিষ্টি জিনিস দ্বারা এবং তদভাবে পানি দ্বারা ইফ্তার করা ভাল। কেহ কেহ লবণ দিয়া ইফ্তার করাকে সওয়াব মনে করে। এই আকীদা ভুল।

১২। মাসআলা ঃ যে পর্যন্ত সূর্যাস্ত সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে, সে পর্যন্ত ইফ্তার করা জায়েয নহে।

যে সব কারণে রোযা রাখিয়াও ভাঙ্গা যায়

১। মাসআলা ঃ রোযা রাখিয়া হঠাৎ যদি এমন কোন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে যে, কিছু দাওয়া-পানি না খাইলে জীবনের আশঙ্কা হইতে পারে বা রোগ অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতে পারে, তবে এইরূপ অবস্থায় রোযা ছাড়িয়া দিয়া ঔষধ সেবন করা জায়েয আছে। যেমন, হঠাৎ পেটে এমন বেদনা উঠিল যে, একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল, অথবা সাপে দংশন করিল যে, ঔষধ না খাইলে জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হয়, এইরূপে যদি এমন ভীষণ পিপাসা হয় যে, প্রাণ নাশের আশংকা হয়, তবে রোযা ভাঙ্গা জায়েয আছে।

২। মাসআলা ঃ গর্ভবতী মেয়েলোকের যদি এমন অবস্থা হয় যে, নিজের বা সন্তানের প্রাণ নাশের আশংকা হয়, তবে রোযা ভাঙ্গা দুরুস্ত আছে।

৩। মাসআলা ঃ খানা পাকাইবার কারণে যদি এত পিপাসা হয়, প্রাণ নাশের আশংকা হয়, তবে রোযা ছাড়িয়া দেওয়া দুরুস্ত আছে। কিন্তু যদি নিজে স্বেচ্ছায় এমন কাজ করে, যাহাতে এরূপ অবস্থা হয়, তবে গোনাহ্গার হইবে।

যে কারণে রোযা না রাখা জায়েয

১। মাসআলা ঃ কেহ যদি এমন রোগাক্রান্ত হয় যে, যদি রোযা রাখে, তবে (ক) রোগ বাড়িয়া যাইবে, (খ) রোগ দুরারোগ্য হইয়া যাইবে, (গ) জীবন হারাইবার আশঙ্কা হয়, তবে তাহার জন্য তখন রোযা না রাখিয়া আরোগ্য লাভ করার পর ক্বাযা রাখা দুরুস্ত আছে। কিন্তু শুধু নিজের কাল্পনিক খেয়ালে রোযা ছাড়া জায়েয নহে, যখন কোন মুসলমান দ্বীনদার চিকিৎসক সার্টিফিকেট (সাক্ষ্য) দিবেন যে, রোযা তোমার ক্ষতি করিবে, তখন রোযা ছাড়া জায়েয হইবে।

২। মাসআলা ঃ চিকিৎসক, ডাক্তার বা কবিরাজ যদি কাফের (অমুসলমান) হয়, অথবা এমন মুসলমান হয় যে, দ্বীন-ঈমানের পরওয়া রাখে না, তবে তাহার কথায় রোযা ছাড়া যাইবে না।

৩। মাসআলা ঃ রোগী যদি নিজেই বহুদর্শী জ্ঞানী হয় এবং বারবার পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়া থাকে যে, এই রোগে রোযা রাখিলে নিশ্চয় ক্ষতি হইবে এবং মনেও এইরূপ সাক্ষ্য দেয় তবে নিজের মনের সাক্ষ্যের উপর রোযা ছাড়িতে পারে। কিন্তু যদি নিজে ভুক্তভোগী জ্ঞানী না হয়, তবে শুধু কাল্পনিক খেয়ালের কোনই মূল্য নাই। কাল্পনিক খেয়ালের বশীভূত হইয়া কিছুতেই রোযা ছাড়িবে না। এইরূপ অবস্থায় দ্বীনদার চিকিৎসকের সাক্ষ্য (সনদ) ব্যতিরেকে রোযা ছাড়িলে কাফ্ফারা দিতে হইবে। রোযা না রাখিলে গোনাহ্ হইবে।

৪। মাসআলা ঃ রোগ আরোগ্য হওয়ার পর যে দুর্বলতা থাকে, সেই দুর্বল অবস্থায় যদি রোযা রাখিলে পুনরায় রোগাক্রান্ত হওয়ার প্রবল আশংকা থাকে, তবে সে অবস্থায় রোযা না রাখা জায়েয আছে।

৫। মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি বাড়ী হইতে ৪৮ মাইল বা তদূর্ধ্ব দূরবর্তী স্থানে যাইবার এরাদা করিয়া নিজ বাসস্থানের লোকদের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, তাহাকে শরীঅতের পরিভাষায় 'মুসাফির' বলে। অবশ্য যাহারা শরীঅত অনুসারে মুসাফির তাহারা সফরে থাকাকালীন রোযা ছাড়িয়া দিয়া অন্য সময় রাখিতে পারে।

৬। মাসআলা ঃ শরয়ী সফরে যদি কোন কষ্ট না হয়, যেমন গাড়ীতে ভ্রমণ করিতেছে, ধারণা এই যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ী পৌঁছিয়া যাইবে, কিংবা সঙ্গে আরামের দ্রব্য আছে। তবে রোযা রাখাই উত্তম, কিন্তু না রাখিলে গোনাহ্ হইবে না; অবশ্য রমযানের ফযীলত পাইবে না। যদি রোযা রাখিতে কষ্ট হয়, তবে রোযা না রাখাই ভাল।

৭। মাসআলা ঃ যদি কেহ পীড়িতাবস্থায় মারা যায়, অথবা শরয়ী সফরেই মৃত্যু হয়, তবে যে কয়টি রোযা এই রোগের অথবা এই সফরের জন্য ছুটিয়াছে, আখেরাতে তাহার জন্য দায়ী হইবে না। কেননা, সে ক্বাযা রোযা রাখিবার সময় পায় নাই।

৮। মাসআলা ঃ কেহ পীড়িতাবস্থায় ১০টি রোযা ছাড়িয়াছে এবং পরে পাঁচ দিন ভাল থাকিয়া মৃত্যু হইল, এখন পাঁচটি রোযা মা'ফ পাইবে, কিন্তু যে পাঁচ দিন ভাল ছিল অথচ ক্বাযা রোযা রাখে নাই, সেই পাঁচটি রোযার জন্য দায়ী হইবে এবং কিয়ামতের হিসাবের সময় তাহার জন্য ধর-পাকড় হইবে। আর যদি রোগ আরোগ্য হওয়ার পর পূর্ণ দশ দিন ভাল থাকিয়া থাকে, তবে পূর্ণ দশটি রোযার জন্যই দায়ী হইবে এবং কিয়ামতের দিন ধর-পাকড় হইবে। কাজেই যদি কাহারও এইরূপ অবস্থা হয় তবে তাহার মৃত্যুর আলামত দেখিলেই তাহার মাল থাকিলে বাকী রোযার ফিদ্‌য়া আদায় করার জন্য অছিয়ত করিয়া যাওয়া উচিত (মাল থাকা সত্ত্বেও যদি অছিয়ত না করে, তবে শক্ত গোনাহ্‌গার হইবে।) ফিদ্‌য়ার বয়ান সামনে আসিতেছে।

৯। মাসআলা ঃ এইরূপ যদি কেহ শরয়ী সফরের মধ্যে রোযা না রাখে এবং বাড়ীতে ফিরিয়া কয়েক দিন পর মারা যায়, তবে যে কয়দিন বাড়ীতে আসিয়া ভাল রহিয়াছে, সেই কয় দিনের জন্য ধর-পাকড় হইবে, সেই কয়টি রোযার ফিদ্‌য়ার জন্য অছিয়ত করিয়া যাওয়া তাহার উপর ওয়াজিব। যে কয়দিন বাড়ীতে রহিয়াছে, রোযা যদি তাহা অপেক্ষা বেশী ছুটিয়া থাকে, তবে বেশী রোযার ফিদ্‌য়া তাহার উপর ওয়াজিব নহে এবং সেজন্য মুয়াখাযা (জবাবদেহী করিতে)-ও হইবে না।

১০। মাসআলা ঃ শরয়ী সফরে বাহির হওয়ার পর যদি বিদেশে কোন স্থানে ১৫ দিন বা তাহার বেশী অবস্থান করিবার নিয়্যত করে, তবে সেখানে থাকাকালে রোযা ছাড়া দুরুস্ত নহে। কেননা, কমপক্ষে ১৫ দিন কোন স্থানে অবস্থান করার নিয়্যত করিলে শরা' অনুসারে সে মুক্বীম হইয়া যায়, মুসাফির থাকে না। অবশ্য যদি ১৫ দিনের কম থাকার নিয়্যত করে, তবে রোযা না রাখা জায়েয আছে।

১১। মাসআলা ঃ গর্ভবতী মেয়েলোকের অথবা সদ্যপ্রসূত শিশুর স্তন্যদায়িনী মেয়েলোকের রোযা রাখিলে রোযা যদি নিজের বা শিশুর জীবনের আশঙ্কা হয়, তবে তাহাদের জন্য রোযা না রাখা দুরুস্ত আছে। তাহারা পরে অন্য সময় ক্বাযা রোযা রাখিয়া লইবে। অবশ্য যদি স্বামী মালদার হয় এবং অন্য কোন ধাত্রী রাখিয়া শিশুকে দুধ পান করাইতে পারে, তবে মায়ের জন্য রোযা ছাড়া জায়েয নহে। কিন্তু যদি শিশু এমন হয় যে, সে তাহার মায়ের দুধ ছাড়া অন্যের দুধ মুখেই লয় না, তবে (শিশুর দুধের জন্য) মায়ের রোযা না রাখা দুরুস্ত আছে।

১২। মাসআলা ঃ কোন মেয়েলোক ধাত্রীর চাকুরী লইয়াছে। তাহাকে কোন বড় লোকের ছেলেকে দুধ পান করাইতে হয়, অন্যথায় শিশু বাঁচে না। এই অবস্থায় যদি রমযান মাস আসিয়া পড়ে, তবে তাহার জন্য তখন রোযা না রাখিয়া পরে ক্বাযা রাখা দুরুস্ত আছে।

১৩। মাসআলা ঃ মেয়েলোকের যদি রোযার মধ্যে হায়েয বা নেফাস উপস্থিত হয়, তবে তদবস্থায় রোযা রাখা দুরুস্ত নহে, পরে রাখিবে।

১৪। মাসআলা ঃ রাত্রে যদি মেয়েলোকের হায়েয বন্ধ হয়, তবে সকালে রোযা ছাড়িবে না, রোযার পর যদি রাত্রে গোসল নাও করে, তবুও রোযা ছাড়িতে পাড়িবে না। আর যদি ছোব্‌হে ছাদেক হওয়ার পর রক্ত বন্ধ হয়, তবে রোযার নিয়্যত করা জায়েয হইবে না। অবশ্য দিন ভরিয়া কিছু পানাহার করা দুরুস্ত নাই। সারাদিন রোযাদারের মত থাকিবে।

১৫। মাসআলা ঃ যদি কেহ রমযান শরীফে দিনের বেলায় নূতন মুসলমান হয় বা বালেগ হয়, তবে তাহাদের জন্য অবশিষ্ট দিন কিছু খাওয়া-দাওয়া করা দুরুস্ত নহে, কিন্তু যদি কিছু খায়, তবে যে দিনের বেলায় বালেগ হইয়াছে বা নূতন মুসলমান হইয়াছে, তাহার ঐ দিনের ক্বাযা ওয়াজিব নহে।

১৬। মাসআলা ঃ কেহ যদি সফরের কারণে রোযার নিয়্যত না করে, কিন্তু কিছু খাওয়া-দাওয়ার পূর্বে দুপুরের এক ঘণ্টা পরে বাড়ী পৌঁছিয়া যায়, অথবা কোন স্থানে ১৫ দিন অবস্থানের নিয়্যত করে, তবে তাহার ঐ সময় রোযার নিয়্যত করিতে হইবে।

[মাসআলা ঃ কেহ রোযার নিয়্যত করার পর যদি সফর শুরু করে, তবে তাহার জন্য ঐ রোযাটি ছাড়িয়া দেওয়া জায়েয নহে। এইরূপে যে ব্যক্তি সকাল বেলায় সফরে যাইবে তাহার জন্য রোযার নিয়্যত না করা জায়েয নহে। এইরূপে মুছাফের যদি রোযার নিয়্যত করিয়া থাকে, তবে তাহার জন্য ঐ রোযাটি ছাড়া জায়েয নহে।]

ফিদ্‌ইয়া

[(নামায বা) রোযার পরিবর্তে যে ছদ্‌কা দেওয়া হয়, তাহাকে "ফিদ্‌য়া" বলে এবং রমযান শরীফের বর্‌কত, রহ্‌মত ও হুকুম পালনে সক্ষম হওয়ার খুশীতে বান্দা ঈদের দিন নিজের তরফ হইতে এবং নিজের পরিবারবর্গের তরফ হইতে যাহাকিছু ছদ্‌কা করে, তাহাকে "ফেৎরা" বলে। ফেৎরার কথা পরে বর্ণিত হইবে। এখানে ফিদ্‌য়া সম্বন্ধে বর্ণিত হইতেছে।]

১। মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি এত বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, তাহার আর রোযা রাখার শক্তি নাই, বা এত রোগা ও দুর্বল হইয়াছে যে, তাহার আর ভাল হইবার আশা নাই। এইরূপ লোকের জন্য শরীঅতে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যে, সে প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে হয় একজন মিস্‌কীনকে দুই ওয়াক্ত পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দিবে, না হয় একটি রোযার পরিবর্তে একজন মিস্‌কীনকে ছদ্‌কায়ে ফেৎরা পরিমাণ (/১৸১০) গম বা তাহার মূল্যের চাউল বা পয়সা দান করিবে। ইহাকেই শরীঅতের ভাষায় ফিদ্‌য়া বলে।

২। মাসআলা ঃ একটি ফিদ্‌য়া একজন মিস্‌কীনকে দেওয়াই উত্তম। কিন্তু যদি একটি ফিদ্‌য়া কয়েকজন মিসকীনকে কিছু কিছু করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও দুরুস্ত আছে।

৩। মাসআলা ঃ বৃদ্ধ যদি পুনরায় কখনও রোযা রাখার শক্তি পায়, অথবা চিররোগী নিরাশ ব্যক্তি পুনরায় আরোগ্যলাভ করে এবং রোযা রাখার শক্তি পায়, তবে যে সব রোযার তাহার

ফিদ্‌য়া দিয়াছে সে সব রোযার ক্বাযা তাহাদের করিতে হইবে এবং যাহা ফিদ্‌য়া দান করিয়াছে তাহার সওয়াব পৃথকভাবে পাইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** যাহার যিম্মায় ক্বাযা থাকে, তাহার মৃত্যুর পূর্বে অছিয়ত করিয়া যাইতে হইবে যে, আমার এতগুলি রোযা ক্বাযা আছে, তোমরা ইহার ফিদ্‌য়া আদায় করিয়া দিও। এইরূপ অছিয়ত করিয়া গেলে তাহার স্থাবর-অস্থাবর ষোল আনা সম্পত্তি হইতে—(১) আগে তাহার কাফনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। (২) তারপর তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে (যদি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াও ঋণ পরিশোধ করার দরকার পড়ে, তাহাও করিতে হইবে। ঋণ পরিশোধের পূর্বে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে ওয়ারিশগণের কোন অধিকার থাকে না। (৩) তারপর যাহাকিছু অবশিষ্ট থাকে তাহার তিন ভাগের এক ভাগ দ্বারা অছিয়ত পূর্ণ করিতে ওয়ারিশগণ শরীঅতের আইন মতে বাধ্য। যদি অবশিষ্ট সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ দ্বারা সম্পূর্ণ অছিয়ত পূর্ণ না হয়, তবে যে পরিমাণ আদায় হয়, সেই পরিমাণ আদায় করা ওয়াজিব এবং যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা যদি ওয়ারিশগণ নিজ খুশীতে আদায় করিয়া দেয়, তবে তাহাদের পক্ষে ইহা অতি উত্তম হইবে এবং মৃত ব্যক্তির পক্ষে নাজাতের উপায় হইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** মৃত ব্যক্তি যদি অছিয়ত না করে এবং যাহারা ওলী-ওয়ারিশ থাকে তাহারা নিজের তরফ হইতে তাহার রোযা-নামাযের ফিদ্‌য়া দেয়, তবুও আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজ দয়াগুণে তাহা কবূল করিয়া নিবেন এবং মৃত ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন। যদি অছিয়ত না করিয়া থাকে, তবে মৃত ব্যক্তির মাল হইতে ফিদ্‌য়া দেওয়া জায়েয নাই। এইরূপে যদি ফিদ্‌য়া এক তৃতীয়াংশ হইতে বেশী হয়, তবে অছিয়ত করা সত্ত্বেও সকল ওয়ারিশের অনুমতি ছাড়া বেশী দেওয়া জায়েয নাই। অবশ্য যদি সকলে খুশী হইয়া অনুমতি দেয়, তবে উভয় অবস্থায় ফিদ্‌য়া দেওয়া দুরুস্ত আছে। কিন্তু শরীঅতে না-বালেগ ওয়ারিশের অনুমতির কোন মূল্য নাই। বালেগ ওয়ারিশগণ নিজ নিজ অংশ পৃথক করিয়া যদি উহা হইতে দেয়, তবে দুরুস্ত আছে।

৬। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও নামায ক্বাযা হইয়া থাকে এবং অছিয়ত করিয়া মারা যায় যে, আমার নামাযের বদলে ফিদ্‌য়া দিয়া দিও, তাহারও এই হুকুম।

৭। **মাসআলা ঃ** প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের ফিদ্‌য়া একটি রোযার ফ্‌িয়ার পরিমাণ। এই হিসাবে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরয এবং বেৎর এই ছয় নামাযের ফিদ্‌য়া ৮০ তোলা সেরের এক ছটাক কম পৌণে এগার সের (দশ সের বার ছটাক) গম দিবে। কিন্তু সতর্কতার জন্য পুরা বার সের দিবে।

৮। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও যিম্মায় যাকাত থাকিয়া যায়, (অর্থাৎ, যাকাত ফরয হইয়াছিল, না দিতেই মৃত্যু হইয়া গিয়াছে) কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে যদি অছিয়ত করিয়া যায় যে, আমার যিম্মায় এত টাকা যাকাৎ ফরয হইয়া রহিয়াছে, তোমরা আদায় করিয়া দিও, তবে ঐ পরিমাণ যাকাৎ আদায় করা ওয়ারিশগণের উপর ওয়াজিব হইবে। যদি অছিয়ত না করিয়া থাকে এবং যদি ওয়ারিশগণ নিজ খুশীতে দেয়, তবে যাকাত আদায় হইবে না, (তবে দেওয়া ভাল।) আল্লামা শামী ছেরাজুল ওয়াহ্‌হাজ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, যদি ওয়ারিশগণ অছিয়ত ব্যতীত আদায় করে, তবে আদায় হইয়া যাইবে। (খোদা তা'আলার দরবারে আশা করা যায় যে, মৃতব্যক্তি তদ্দ্বারাও নাজাত পাইয়া যাইতে পারে।)

৯। **মাসআলা ঃ** যদি ওলী মৃত ব্যক্তির পক্ষে ক্বাযা রোযা রাখে বা ক্বাযা নামায পড়ে, তবে দুরুস্ত নহে। অর্থাৎ, তাহার যিম্মার ক্বাযা আদায় হইবে না।

১০। মাসআলা ঃ অকারণে রমযানের রোযা না রাখা দুরুস্ত নাই। ইহা অতি বড় গোনাহ্। এরূপ মনে করিবে না যে, ইহার বদলে রোযা ক্বাযা করিয়া লইবে। কেননা, হাদীসে আছে—রমযানের এক রোযার বদলে যদি পূর্ণ বৎসর একাধারে রোযা রাখে, তবু এতটুকু সওয়াব পাইবে না, যতটুকু রমযানের একটি রোযার সওয়াব পাওয়া যায়।

১১। মাসআলা ঃ দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি কেহ রোযা না রাখে, তবে অন্যান্য লোকের সম্মুখে পানাহার করিবে না। ইহাও প্রকাশ করিবে না যে, আমি রোযা রাখি নাই। কেননা, গোনাহ্ করিয়া উহা প্রকাশ করাও গোনাহ্। যদি প্রকাশ্যে বলিয়া বেড়ায়, তবে দ্বিগুণ গোনাহ্ হইবে। একটি রোযা না রাখার এবং অপরটি গোনাহ্ প্রকাশ করার। বলিয়া থাকে—যখন খোদার কাছে গোপন নাই, তবে মানুষের কাছে গোপন করিয়া কি লাভ? ইহা ভুল। বরং কোন কারণে রোযা রাখিতে না পারিলে লোকের সামনে খাওয়া উচিত নহে।

১২। মাসআলা ঃ ছেলেমেয়েরা যখন ৮/৯ বৎসর বয়সের হইয়া রোযা রাখার মত শক্তিসম্পন্ন হয়, তখনই তাহাদিগকে রোযা রাখার অভ্যাস করান উচিত। যদি নাও রাখিতে পারে, তবুও কিছু অভ্যাস করান উচিত। ছেলেমেয়ে যখন দশ বৎসরের হইয়া যায়, তখন শাস্তি দিয়া হইলেও তাহাদের দ্বারা রোযা রাখান, নামায পড়ান উচিত।

১৩। মাসআলা ঃ না-বালেগ ছেলেমেয়েরা যদি রোযা শুরু করিয়া শক্তিতে না কুলানের কারণে রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চায়, তবে ভাঙ্গিতে দেওয়া ভাল নহে বটে; কিন্তু যদি ভাঙ্গিয়া ফেলে তবে রোযা আর দোহ্রাইয়া রাখার দরকার নাই; কিন্তু যদি নামায শুরু করিয়া নিয়ত ছাড়িয়া দেয়, তবে নামায দোহ্রাইয়া পড়ান উচিত।

এ'তেকাফ (গাওহর ৩য় খণ্ডসহ)

২০শে রমযান সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পূর্ব হইতে ২৯/৩০ তারিখ অর্থাৎ যে দিন ঈদের চাঁদ দেখা যাইবে সে তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত পুরুষদের মসজিদে এবং মেয়েদের নিজ গৃহের যেখানে নামায পড়ার স্থান নির্ধারিত আছে তথায় পাবন্দীর সহিত অবস্থান করাকে এ'তেকাফ বলে। ইহার সওয়াব অনেক বেশী। এ'তেকাফ শুরু করিলে পেশাব পায়খানা কিংবা পানাহারের মজবুরী হইলে তথা হইতে অন্যত্র যাওয়া দুরুস্ত আছে। আর যদি খানা পানি পৌঁছাইবার লোক থাকে, তবে ইহার জন্য বাহিরে যাইবে না, সেখানেই থাকিবে। বেকার বসিয়া থাকা ভাল নহে। কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করিবে, নফল নামায, তসবীহ্ সাধ্যমত পড়িতে থাকিবে এবং ঘুমাইবে। হায়েয বা নেফাস আসিলে এ'তেকাফ ছাড়িয়া দিবে। এই অবস্থায় এ'তেকাফ দুরুস্ত নাই। এ'তেকাফে স্বামী-স্ত্রী মিলন (সহবাস) আলিঙ্গনও দুরুস্ত নাই।

মাসআলা ঃ এ'তেকাফের জন্য তিনটি বিষয় যরূরী।

(১) যেই মসজিদে নামাযের জমা'আত হয়, (পুরুষের) উহাতে অবস্থান করা। এ'তেকাফের নিয়তে অবস্থান করা। এরাদা ব্যতীত অবস্থান করাকে এ'তেকাফ বলে না। যেহেতু নিয়ত ছহীহ্ হওয়ার জন্য নিয়তকারীর মুসলমান এবং আক্বেল হওয়া শর্ত কাজেই এই উভয়টি নিয়তের শামিল। হায়েয-নেফাস ও গোসলের প্রয়োজন হইতে পাক হওয়া।

২। মাসআলা ঃ এ'তেকাফের জন্য সর্বোত্তম স্থান হইল (কা'বা শরীফের) মসজিদে-হারাম। তারপর মসজিদে নববী, তারপর মসজিদে বায়তুল মুকাদ্দস। তারপর যে জামে মসজিদে জমা'আতের এন্তেযাম আছে। অন্যথায় মহল্লার মসজিদ। তারপর যে মসজিদে বড় জমা'আত হয়।

৩। মাসআলা ঃ এ'তেকাফ তিন প্রকার। (১) ওয়াজিব, (২) সুন্নতে মুআক্কাদা, (৩) মোস্তাহাব। মান্নতের এ'তেকাফ ওয়াজিব, বিনাশর্তে—হউক যেমন কেহ কোন শর্ত ব্যতীত এ'তেকাফের মান্নত করিল, কিংবা শর্তের সহিত হউক; যেমন, কেহ শর্ত করিল যে, যদি আমার অমুক কাজ হইয়া যায়, তবে আমি এ'তেকাফ করিব। রমযানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করা সুন্নতে মুআক্কাদা। নবী (দঃ) নিয়মিতভাবে প্রত্যেক রমযানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করিয়াছেন বলিয়া ছহীহ্ হাদীসে উল্লেখ আছে। কিন্তু এই সুন্নতে মুআক্কাদা কেহ কেহ করিলে সকলেই দায়িত্বমুক্ত হইবে। রমযানের এই শেষ দশ দিন ব্যতীত, প্রথম দশ দিন হউক বা মাঝের দশ দিন হউক বা অন্য কোন মাসে হউক এ'তেকাফ করা মোস্তাহাব।

৪। মাসআলা ঃ ওয়াজিব এ'তেকাফের জন্য রোযা শর্ত। যখনই এ'তেকাফ করিবে, রোযাও রাখিতে হইবে। বরং যদি ইহাও নিয়ত করে যে, রোযা রাখিব না, তবুও রোযা রাখিতে হইবে। এ জন্য যদি কেহ রাত্রের এ'তেকাফের নিয়ত করে, তবে উহা বেহুদা মনে করিতে হইবে। কেননা, রাত্রে রোযা হয় না, অবশ্য যদি রাত্র দিন উভয়ের নিয়ত করে কিংবা কয়েক দিনের নিয়ত করে, তবে তৎসঙ্গে রাত শামিল হইবে এবং রাত্রেও এ'তেকাফ করা যরূরী হইবে। আর যদি শুধু এক দিনের এ'তেকাফের মান্নত করে, তবে তৎসঙ্গে রাত শামিল হইবে না। খাছ করিয়া এ'তেকাফের জন্য রোযা রাখা যরূরী নহে। যে কোন উদ্দেশ্যে রোযা রাখুক এ'তেকাফের জন্য যথেষ্ট। যেমন কোন ব্যক্তি রমযান শরীফের এ'তেকাফের মান্নত করিল, রমযানের রোযা এ'তেকাফের জন্যও যথেষ্ট। অবশ্য এই রোযা ওয়াজিব রোযা হওয়া যরূরী। নফল রোযা উহার জন্য যথেষ্ট নাহে। যেমন নফল রোযা রাখার পর এ'তেকাফের মান্নত করিলে ছহীহ্ হইবে না। যদি কেহ পুরা রমযান মাসের এ'তেকাফের মান্নত করে এবং ঘটনাক্রমে রমযানের এ'তেকাফ করিতে না পারে, তবে অন্য যে কোন মাসে এ'তেকাফ করিলে মান্নত পুরা হইবে। কিন্তু একাধারে রোযাসহ এ'তেকাফ করা যরূরী হইবে।

৫। মাসআলা ঃ সুন্নত এ'তেকাফে তো রোযা হইয়াই থাকে। কাজেই উহার জন্য রোযা শর্ত করার প্রয়োজন নাই।

৬। মাসআলা ঃ কাহারও মতে মোস্তাহাব এ'তেকাফেও রোযা শর্ত। নির্ভরযোগ্য মতে শর্ত নহে।

৭। মাসআলা ঃ ওয়াজিব এ'তেকাফ কমপক্ষে একদিন হইতে হইবে। আর বেশী যত দিনের নিয়ত করিবে (তাহাই হইবে)। আর সুন্নত এ'তেকাফ দশ দিন। কেননা, সুন্নত এ'তেকাফ রমযান শরীফের শেষ দশ দিন। মোস্তাহাব এ'তেকাফের জন্য কোন পরিমাণ নির্ধারিত নাই, এক মিনিট বা উহা হইতেও কম হইতে পারে।

৮। মাসআলা ঃ এ'তেকাফ অবস্থায় দুই প্রকার কাজ হারাম। অর্থাৎ উহা করিলে ওয়াজিব ও সুন্নত এ'তেকাফ ফাসেদ হইবে এবং ক্বাযা করিতে হইবে। মোস্তাহাব এ'তেকাফ হইলে উহা শেষ হইয়া যায়। ইহার জন্য কোন সময় নির্ধারিত নাই। কাজেই উহার ক্বাযাও নাই।

প্রথম প্রকার ঃ (হারাম কাজ) এ'তেকাফের স্থান হইতে তব্‌য়ী (স্বভাবিক) বা শর্‌য়ী প্রয়োজন ছাড়া বাহিরে যাওয়া। স্বাভাবিক প্রয়োজন যেমন, পেশাব পায়খানা, জানাবাতের গোসল, খানা আনিবার কোন লোক না থাকিলে খানা খাইতে যাওয়া। শর্‌য়ী প্রয়োজন যেমন, জুমু'আর নামায।

৯। মাসআলা ঃ যে যরূরতের জন্য এ'তেকাফের মসজিদ হইতে বাহিরে যাইবে ঐ কাজ শেষ হইলে আর তথায় অবস্থান করিবে না। এমন স্থানে যরূরত পুরা করিবে যাহা যথাসম্ভব মসজিদের নিকটবর্তী হয়। যেমন, পায়খানার জন্য গেলে যদি নিজ বাড়ী দূর হয়, তবে নিকটবর্তী কোন বন্ধুর বাড়ীতে যাইবে। অবশ্য যদি নিজ বাড়ী ব্যতীত অন্যত্র গেলে যরূরত পুরা না হয়, তবে দূরে হইলেও নিজ বাড়ীতে যাওয়া জায়েয আছে। যদি জুমু'আর নামাযের জন্য অন্য কোন মসজিদে যায় এবং নামাযের পর সেইখানে থাকিয়া যায় এবং সেখানেই এ'তেকাফ পুরা করে, তবুও জায়েয আছে। অবশ্য মকরূহ্ (তান্‌যিহী)।

১০। মাসআলা ঃ নিজ এ'তেকাফের মসজিদ হইতে ভুলেও এক মিনিট বা তদপেক্ষা কম সময়ের জন্য (অযথা) বাহিরে থাকিতে পারিবে না।

১১। মাসআলা ঃ সাধারণত ঃ যে সব ওযরের সম্মুখীন হইতে হয় না তজ্জন্য এ'তেকাফের স্থান ছাড়িয়া দেওয়া এ'তেকাফের পরিপন্থী। যেমন, কোন (কঠিন) রোগী দেখা, বা কোন ডুবন্ত লোককে বাঁচাইবার চেষ্টা করা, কিংবা আগুন নিবাইতে যাওয়া, কিংবা মসজিদ ভাঙ্গিয়া পড়ার ভয়ে মসজিদ হইতে বাহির হইয়া যাওয়া। যদিও এসব অবস্থায় এ'তেকাফের স্থান হইতে বাহির হইলে গোনাহ্ হইবে না ; বরং জান বাঁচানের জন্য যরূরী, কিন্তু এ'তেকাফ থাকিবে না। যদি কোন শর্‌য়ী বা তব্‌য়ী যরূরতে বাহির হয় এবং ঐ সময় যরূরত পুরা হইবার আগে বা পরে কোন রোগী দেখে, বা জানাযা নামাযে শরীক হয়, তবে কোন দোষ নাই।

১২। মাসআলা ঃ জুমু'আর নামাযের জন্য যদি জামে মসজিদে যাইতে হয়, তবে এমন সময় যাইবে, যেন মসজিদে গিয়া তাহিয়্যাতুল মসজিদ ও সুন্নত পড়িতে পারে। সময়ের অনুমান নিজেই করিয়া লইবে। এবং ফরযের পর সুন্নত পড়ার জন্য দেরী করা জায়েয আছে। অনুমানের ভুলে সামান্য কিছু আগে গেলে কোন দোষ নাই।

১৩। মাসআলা ঃ মু'তাকেফকে বলপূর্বক কেহ বাহিরে লইয়া গেলে এ'তেকাফ থাকিবে না। যেমন, কোন অপরাধে কাহারও নামে ওয়ারেন্ট জারি হইল এবং সিপাহী তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল, কিংবা কোন মহাজন দেনার দায়ে তাহাকে বাহিরে লইয়া গেল।

১৪। মাসআলা ঃ এইরূপে যদি কোন শর্‌য়ী বা তব্‌য়ী যরূরতে বাহিরে যায় এবং পথে কোন মহাজন আটকায়, বা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে, ফলে এ'তেকাফের স্থানে পৌঁছিতে বিলম্ব হয়, তবুও এ'তেকাফ থাকিবে না।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ (হারাম কাজ) ঐ সব কাজ যাহা এ'তেকাফে না-জায়েয। যেমন সহবাস ইত্যাদি করা, ইচ্ছাকৃত হউক বা ভুলে হউক। এ'তেকাফের কথা ভুলিয়া মসজিদে করুক, বা বাহিরে করুক, সর্বাবস্থায় তাহাতে এ'তেকাফ বাতিল হইবে। সহবাসের আনুষঙ্গিক সব কাজ যেমন চুম্বন করা, আলিঙ্গন করা, এ'তেকাফ অবস্থায় না-জায়েয। কিন্তু ইহাতে বীর্যপাত না হইলে এ'তেকাফ বাতিল হয় না। বীর্যপাত হইলে এ'তেকাফ ফাসেদ হইবে। অবশ্য যদি শুধু কল্পনা বা চিন্তার কারণে বীর্যপাত হয় তবে এ'তেকাফ ফাসেদ হইবে না।

১৫। মাসআলা ঃ এ'তেকাফ অবস্থায় বিনা যরূরতে দুনিয়াদারীর কাজে লিপ্ত হওয়া মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। যেমন, বিনা যরূরতে কেনাবেচা, বা ব্যবসা সংক্রান্ত কোন কাজ করা। অবশ্য যে কাজ নেহায়েত যরূরী (যেমন, ঘরে খোরাকী নাই, সে ব্যতীত বিশ্বাসী কোন লোকও নাই, এমতাবস্থায় কেনাবেচা জায়েয আছে, কিন্তু মালপত্র মসজিদে আনা কোন অবস্থায়ই জায়েয নাই—যদি উহা মসজিদে আনিলে মসজিদ খারাব হওয়ার কিংবা জায়গা আবদ্ধ হওয়ার আশংকা হয়। অন্যথায় কেহ কেহ জায়েয বলিয়াছেন।

১৬। মাসআলা ঃ এ'তেকাফ অবস্থায় (সওয়াব মনে করিয়া) একেবারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। অবশ্য খারাব কথা, মিথ্যা কথা বলিবে না বা গীবত করিবে না; বরং কোরআন মজীদ তেলাওয়াত, দ্বীনি এল্‌ম শিক্ষা করা বা শিক্ষা দেওয়া, কিংবা অন্য কোন এবাদতে কাটাইবে। সার কথা, চুপ করিয়া বসিয়া থাকা কোন এবাদত নহে।

এ'তেকাফ সম্বন্ধে একটি মাসআলা—অনুবাদক

হযরত মাওলানা যাফর আহ্‌মদ ওসমানী থানভী ছাহেবের নিকট হইতে নিম্ন মাসআলাটি সমাধান করিয়াছি—

হযরত মাওলানা ছাহেবের নিকট আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযূর! আমরা বাংলাদেশবাসী দৈনিক গোসল করিতে অভ্যস্ত। যদি আমরা গোসল না করি, তবে আমাদের স্বাস্থ্য ঠিক থাকে না; অথচ ফেকাহ্‌র কিতাবসমূহে কোথাও এইরূপ গোসলের জন্য এ'তেকাফ অবস্থায় মসজিদ হইতে বাহির হওয়ার কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

হুযূর বলিলেন, 'পায়খানার জন্য বাহির হওয়া জায়েয আছে ত? পায়খানা হইতে ফিরিবার সময় অতিরিক্ত সময় না লাগাইয়া যদি গোসল করিয়া ফেলে; যেমন—পথের মধ্যে যদি বেশী পানি পায়, তবে ডুব দিয়া লইতে পারে বা পূর্বে কাহাকেও বলিয়া পথের মধ্যে পানির বন্দোবস্ত রাখিলে এবং জলদি ঐ পানি গায়ে মাথায় ঢালিয়া গোসল করিয়া চলিয়া আসিলে এ'তেকাফের কোন ক্ষতি হইবে না।'

এই উত্তরের পর আমাদের পক্ষ হইতে আলেমগণ অনেক প্রতিবাদ করেন। তিনি তাহার উত্তরে বলিলেন, 'পায়খানার পর বাহির হইতে ওযূ করিয়া আসা জায়েয কি না? ওযূ ছোট তাহারাত, গোসল বড় তাহারাত; কাজেই না জায়েয হওয়ার কি কারণ হইতে পারে?

পুনঃ প্রশ্ন করা হয়, গোসল যে বড় তাহারাত তাহার প্রমাণ কি? এ ক্ষেত্রে গোসল ত ফরয নহে। তদুত্তরে তিনি বলেন, 'হেদায়া কিতাবে আছে যে, যখন ওযূ না থাকে, তখন সমস্ত শরীরই নাপাক হয়; কাজেই আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হওয়ার জন্য সমস্ত শরীর ধৌতকে শুধু অঙ্গগুলি ধৌত করার দ্বারা পরিবর্তন খোদার রহমতে সমস্ত শরীর ধৌতকে শুধু ওযূর অঙ্গগুলি ধৌত করার দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, গোসল বড় তাহারাত।' হযরত মাওলানা বলিলেন, 'এই তাহ্‌কীক এবং এই তকরীর আমার নিজের তরফ হইতে নহে। বরং জনাব মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী মোহাজেরে মদীনা ছাহেবের পক্ষ হইতে। তিনি অতি বড় মোহাদ্দেস ও বড় বুযুর্গ ত ছিলেনই, অতি বড় ফকীহ্‌ও ছিলেন।'

এ'তেকাফের ফযীলত

১। **হাদীস ঃ** যে ব্যক্তি রমযান শরীফের (শেষ) দশ দিন এ'তেকাফ করিবে, উহা তাহার জন্য দুইটি হজ্জ এবং দুইটি ওমরার সমতুল্য হইবে অর্থাৎ দুই হজ্জ এবং দুই ওমরার সমান সওয়াব তাহাকে দান করা হইবে। —বায়হাকী

২। **হাদীস ঃ** যে ব্যক্তি খালেছ নিয়তে এবং খাঁটি ঈমানের সহিত সওয়াবের উদ্দেশ্যে এ'তেকাফ করিবে, তাহার পূর্ববর্তী (সমস্ত ছগীরা) গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দেওয়া হইবে। —দায়লামী।

৩। হাদীস শরীফে আছে ঃ ইসলামী রাজত্বের সীমা রক্ষা করার পূর্ণ ফযীলত নিয়মিতরূপে ৪০ দিন পর্যন্ত সীমা রক্ষা করিলে হাছেল হয়। অতএব, যে ব্যক্তি ৪০ দিন পর্যন্ত ইসলামী রাজত্বের সীমা পূর্ণরূপে এমনভাবে রক্ষা করিবে যে, ঐ মুদ্দতের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় এবং শরী-অতের গণ্ডীর বাহিরের যাবতীয় কাজ পরিত্যাগ করিবে , সে তাহার সমস্ত গোনাহ্ হইতে এমন পবিত্র হইয়া যাইবে, যেমন ছিল তাহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন। অর্থাৎ সমস্ত গোনাহ্ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র হইয়া যাইবে। (এই হাদীসে দুনিয়ার যাবতীয় পাপ এবং যাবতীয় সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া এমন কি, জায়েয ও হালাল সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া) ৪০ দিন যাবৎ এ'তেকাফে থাকিয়া যেকের, মোরাক্বাবা, নামায, রোযা ইত্যাদি যাহেরী ও বাতেনী ইবাদতের মধ্যে মশ্‌গুল থাকাকে এবং সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র হইয়া যাওয়াকে ইসলামী রাজত্বের সীমা রক্ষা করা বলা হইয়াছে। (কারণ, এইরূপ কঠোর মুজাহাদা যে করিবে, সে নিশ্চয়ই ইসলামের যাবতীয় হুকুম আহ্‌কাম কষ্ট স্বীকার করিয়াও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিবে এবং ইসলামী রাজত্বের সীমা রক্ষাকারী যেরূপ খলিফাতুল মুসলিমীন আমীরুল মু'মিনীনের আদেশে নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়া, আরাম ও ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিয়া কাফেরদের আক্রমণ হইতে সর্বসাধারণ মুসলমানের জীবন, দ্বীন ও ঈমান রক্ষা করিবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দেয়, তদ্রূপ এই ব্যক্তিও নফ্‌স ও শয়তানের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রতি মুহূর্তে সজাগ ও সতর্ক থাকে। এই জন্যই এই এ'তেকাফ করাকে ইসলামী রাজত্বের সীমা রক্ষাকারীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। আর যে গোনাহ্ মা'ফের কথা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ ছগীরা গোনাহ্। কেননা, কবীরা গোনাহ্ তওবা ব্যতীত এবং "হক্কুল এবাদ" হক্কদারের নিকট মা'ফ চাহিয়া লওয়া বা পরিশোধ করা ব্যতীত মা'ফ হয় না। —তাব্‌রানী

এই হাদীস অনুকরণে ছুফিয়ায়ে কেরাম চিল্লাহ্‌কাশীর নিয়ম পালন করিয়া থাকেন। (এতদ্ব্যতীত অন্যান্য হাদীসে আরও আছে ঃ যে ব্যক্তি ৪০ দিন যাবৎ খালেছ নিয়তে তরকে দুনিয়া করিয়া খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশ্‌গুল থাকিবে, তাহার ক্বল্‌বের ভিতর আল্লাহ্ পাক হেকমতের ফোয়ারা জারি করিয়া দিবেন।

ফেৎরা

১। **মাসআলা ঃ** ঈদের দিন ছোব্‌হে ছাদেকের সময় যে ব্যক্তি হাওয়ায়েজে আছলিয়া অর্থাৎ, জীবিকা নির্বাহের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ (যথা—পরিধানের বস্ত্র, শয়নের গৃহ এবং আহারের

খাদ্য-দ্রব্য) ব্যতীত ৭।।০ তোলা সোনা, অথবা ৫২।।০ (সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা, অথবা এই মূল্যের অন্য কোন মালের মালিক থাকিবে, তাহার উপর ফেৎরা দেওয়া ওয়াজিব হইবে। সে মাল তেজারত বা ব্যবসায়ের জন্য হউক বা না হউক, বা সে মালের বৎসর অতিবাহিত হউক বা না হউক। ফেৎরাকে "ছদ্‌কায়ে ফেৎর" বলে। জীবিকা নির্বাহের আবশ্যকীয় উপকরণসমূহকে "হাওয়ায়েজে আছলিয়া" বলে। (২০০ দেরহাম পরিমাণ সম্পত্তির অধিকারীকে মালেকে নেছাব বলে। আমাদের দেশী হিসাবে ২০০ দেরহামে ৫২।।০ তোলা রূপা হয়।)

২। **মাসআলা ঃ** কাহারও বসবাসের অনেক বড় ঘর আছে, বিক্রয় করিলে হাজার পাঁচ শ; টাকা দাম হইবে। পরিধানের দামী দামী কাপড় আছে, কিন্তু ইহা জরীদার নহে, ২/৪ জন খেদমতগারও আছে, হাজার পাঁচ শত টাকার প্রয়োজনীয় মাল আসবাব আছে; কিন্তু অলংকার নহে। এই সমস্তই কাজে ব্যবহৃত হয়, কিংবা কিছু মালপত্র প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী আছে এবং জরী, অলংকারও আছে, কিন্তু যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পরিমাণ নহে, এমন লোকের উপর ছদ্‌কায়ে ফেৎর ওয়াজিব নহে।

৩। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ মাত্র দুইখানা বাড়ীর মালিক হয়, এক বাড়ীতে নিজে বিবি বাচ্চা নিয়া থাকে, অন্য বাড়ীখানা খালি পড়িয়া থাকে, অথবা ভাড়া দেওয়া হয়, তবে দ্বিতীয় বাড়ীখানাকে হওয়ায়েজে আছলিয়ার মধ্যে গণ্য করা যাইবে না, অতিরিক্ত বলা হইবে। কাজেই দেখিতে হইবে, যদি বাড়ীখানার মূল্য ৫২।।০ তোলা রূপার মূল্যের সমান বা তদূর্ধ্ব হয়, তবে তাহার উপর ছদ্‌কায়ে ফেৎর ওয়াজিব হইবে, এমন লোককে যাকাত দেওয়া জায়েয নাই। কিন্তু যদি এই বাড়ীখানার ভাড়ার উপরই তাহার জীবিকা নির্বাহ নির্ভর করে, তবে বাড়ীখানাকে হওয়ায়েজে আছলিয়ার মধ্যে গণ্য করিতে হইবে এবং তাহার উপর ছদ্‌কায়ে ফেৎর ওয়াজিব হইবে না। এমন ব্যক্তি ছদকায়ে ফেৎর লইতে পারে এবং তাহাকে দেওয়াও জায়েয আছে। সারকথা—যে ব্যক্তি যাকাত, ছদকার পয়সা লইতে পারে তাহার উপর ছদ্‌কা ফেৎরা ওয়াজিব নহে; যাহার ছদ্‌কা যাকাত লওয়া দুরুস্ত নাই তাহার উপর ওয়াজিব। (এইরূপ যদি কেহ ৭ বিঘা জমির মালিক হয় এবং ৬ বিঘা জমির ফসলে তাহার জীবিকা নির্বাহ হইয়া যায়, আর এক বিঘা জমি অতিরিক্ত, ইহার মূল্য ৫২।।০ তোলা রূপার মূল্যের সমান বা তদূর্ধ্ব হয়, তাহার উপর ছদ্‌কায়ে ফেৎর ওয়াজিব হইবে।)

(**মাসআলা ঃ** মেয়েলোকের জেওর হাওয়ায়েজে আছলিয়ার মধ্যে গণ্য নহে। কাজেই যে মেয়েলোকের নিকট ৫২।।০ তোলা রূপা বা সমমূল্যের জেওর থাকিবে তাহার উপর ফেৎরা ওয়াজিব হইবে। ('সূক্ষ্ম হিসাবে যাহাদের উপর ফেৎরা ওয়াজিব [বাধ্যতামূলক] হয় না অথচ দেওয়ার সঙ্গতি আছে, তাহারা যদি নিজ খুশীতে ছদ্‌কা দান করে, তবে তাহা মুস্তাহাব হইবে এবং তাহারা অনেক বেশী সওয়াব পাইবে। কারণ, হাদীস শরীফে আছে, গরীব হওয়া সত্ত্বে কষ্ট করিয়া যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ছদ্‌কা দেয়, তাহার দানকে আল্লাহ্ তা'আলা অনেক বেশী পছন্দ করেন।)

৪। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ করযদার (ঋণগ্রস্ত) থাকে, তবে ঋণ বাদে যদি মালেকে নেছাব হয়, তবে ফেৎরা ওয়াজিব হইবে, নতুবা নয়।

৫। **মাসআলা ঃ** ঈদের দিন যে সময় ছোব্‌হে ছাদেক হয়, সেই সময় ছদ্‌কায়ে ফেৎর ওয়াজিব হয়। কাজেই যদি কেহ ছোব্‌হে ছাদেকের আগে মারা যায়, তবে তাহার উপর ছদ্‌কা ফেৎর ওয়াজিব হইবে না, তাহার সম্পত্তি হইতে দিতে হইবে না এবং মালেকে নেছাবের যে

সন্তান ছোব্‌হে ছাদেকের পূর্বে জন্মিবে তাহার ফেৎরা দিতে হইবে। যে ছোব্‌হে ছাদেকের পরে জন্মিবে তাহার দিতে হইবে না। (এইরূপে যদি কেহ ছোব্‌হে ছাদেকের পর নূতন মুসলমান হয়, তাহার উপরও ফেৎরা ওয়াজিব হইবে না।)

৬। **মাসআলা ঃ** ঈদের নামাযের পূর্বেই ছদ্‌কায়ে ফেৎর দিয়া পরিষ্কার হওয়া মুস্তাহাব। যদি একান্ত আগে না দিতে পারে, তবে পরেই দিবে। পরে দিলেও আদায় হইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** কেহ যদি ঈদের দিনের পূর্বেই রমযানের মধ্যে ফেৎরা দিয়া দেয় তাহাও দুরুস্ত আছে, ঈদের দিন পুনরায় দিতে হইবে না।

৮। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ ঈদের দিন ফেৎরা না দেয়, তবে তাহার ফেৎরা মা'ফ হইয়া যাইবে না, অন্য সময় দিতে হইবে।

(**মাসআলা ঃ** মালেকে নেছাব পুরুষের একটি সাবালেগ সন্তান যদি পাগল হয়, তবে তাহার পক্ষ হইতে ফেৎরা দেওয়া পিতার উপর ওয়াজিব।)

(**মাসআলা ঃ** এতীম সন্তান যদি মালেকে নেছাব হয়, তবে তাদেরও ফেৎরা দিতে হইবে।)

৯। **মাসআলা ঃ** মেয়েলোকের শুধু নিজের ফেৎরা দেওয়া ওয়াজিব। স্বামী, সন্তান, মা, বাপ বা অন্য কাহারও পক্ষ হইতে ওয়াজিব নহে। (কিন্তু পুরুষের নিজেরও দিতে হইবে এবং নিজের ছেলেমেয়েদের পক্ষ হইতেও দিতে হইবে। সন্তান না-বালেগ হইলে তাহাদের ফেৎরা দেওয়া পিতার উপর ওয়াজিব। আর বালেগ হইলে এবং এক পরিবারভুক্ত থাকিলে তাহাদের ফেৎরা, স্ত্রীর ফেৎরা এবং মা বাপ থাকিলে তাঁহাদের ফেৎরা দেওয়া মুস্তাহাব।)

১০। **মাসআলা ঃ** না-বালেগ সন্তানের নিজের মাল থাকিলে যে প্রকারেই মালিক হউক না কেন, ওয়াজিব সূত্রে বা অন্য প্রকারে হউক, তাহাদের মাল হইতে দিতে হইবে। (এবং মাল না থাকিলে পিতাকে নিজের মাল হইতে দিতে হইবে।) যদি ঐ শিশু ঈদের দিন ছোব্‌হে ছাদেক হওয়ার পরে পয়দা হয়, তবে তাহার পক্ষ হইতে ফেৎরা দেওয়া ওয়াজিব নহে।

১১। **মাসআলা ঃ** (ফেৎরার সঙ্গে রোযার কোন সংশ্রব নাই। এই দুইটি পৃথক পৃথক ইবাদত। অবশ্য এই ইবাদতের তাকীদ হয়। অতএব,) যাহারা কোন কারণে রোযা না রাখে, ফেৎরা তাহাদের উপরও ওয়াজিব। আর যাহারা রাখে তাহাদের উপরও ওয়াজিব। উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

১২। **মাসআলা ঃ** ফেৎরা যদি গম বা গমের আটা বা গমের ছাতু দ্বারা আদায় করিতে চায়, তবে আধা ছা' অর্থাৎ ৮০ তোলার সেরে (/১৸১০) এক সের সাড়ে বার ছটাক দিতে হইবে। কিন্তু পূর্ণ দুই সের দিয়া দেওয়াই উত্তম। কেননা, বেশী দিলে কোন ক্ষতি নাই; বরং বেশী সওয়াব পাওয়া যাইবে। পক্ষান্তরে কম হইলে ফেৎরা আদায় হইবে না। আর যব বা যবের ছাতু দ্বারা ফেৎরা আদায় করিতে চাহিলে পূর্ণ এক ছা' অর্থাৎ, তিন সের নয় ছটাক দিতে হইবে পূর্ণ চারি সের দেওয়া উত্তম।

১৩। **মাসআলা ঃ** যদি গম এবং যব ব্যতীত অন্য কোন শস্য যেমন—ধান-চাউল, বুট, কলাই ইত্যাদি দ্বারা ফেৎরা আদায় করিতে চায়, তবে বাজার দরে উপরোক্ত পরিমাণ গম বা যবের যে মূল্য হয়, সেই মূল্যের চাউল, ধান, বুট ইত্যাদি দিলে আদায় হইয়া যাইবে; (মূল্য হিসাব না করিয়া আন্দাজি দুই সের চাউল বা ধান দিলে যদি চাউলের মূল্য কম হয়, তবে ওয়াজিব আদায়

হইবে না। ইহাই আমাদের হানাফী মযহাবের ফতওয়া। শাফেয়ী মযহাবে মূল্য না দিয়া চাউল দিলেও ওয়াজিব আদায় হইবে বটে, কিন্তু পূর্ণ চারি সের চাউল দিতে হইবে।

১৪। মাসআলা ঃ যদি গম বা যব না দিয়া উপরোক্ত পরিমাণ গম বা যবের মূল্য নগদ পয়সা দিয়া দেয়, তবে তাহা সবচেয়ে উত্তম;

১৫। মাসআলা ঃ একজনের ফেৎরা একজনকে দেওয়া বা একজনের ফেৎরা কয়েকজনকে ভাগ করিয়া দেওয়া উভয়ই জায়েয আছে।

১৬। মাসআলা ঃ যদি কয়েকজনের ফেৎরা একজনকে দেওয়া হয়, তাহাও দুরুস্ত আছে, (কিন্তু তদ্দ্বারা মিসকীন যেন মালেকে নেছাব না হইয়া যায়।)

১৭। মাসআলা ঃ যাহার জন্য যাকাত খাওয়া হালাল, তাহার জন্য ফেৎরা খাওয়াও হালাল।

মাসআলা ঃ প্রশ্ন ঃফেৎরা কাহাকে দিতে হইবে? **উত্তর ঃ** আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী এবং পার্শ্ববর্তী লোকদের মধ্যে যাহারা গরীব-দুঃখী আছে তাহাদিগকে দিতে হইবে। সাইয়্যেদকে, মালদারকে, মালদারের নাবালেগ সন্তানকে এবং নিজের মা, বাপ, দাদা, নানা, নানী বা নিজের ছেলেমেয়ে, নাতি নাতনী ইত্যাদিকে ফেৎরা, যাকাত দেওয়া জায়েয নহে। অবশ্য সাইয়্যেদ বা মা, বাপ, দাদা, দাদী, নানা, নানী বা ছেলেমেয়ে, নাতি, নাতনী যদি গরীব হয়, তবে তাহাদিগকে হাদিয়া-তোহ্‌ফা স্বরূপ পৃথকভাবে দান করিয়া সাহায্য করিতে হইবে।

মাসআলা ঃ মসজিদের ইমাম, মোয়ায্‌যিন বা তারাবীহ্‌র ইমাম গরীব হইলে তাহাদিগকেও ফেৎরা দেওয়া দুরুস্ত আছে, কিন্তু নেছাব পরিমাণ দেওয়া যাইবে না এবং বেতন স্বরূপও দেওয়া যাইবে না। বেতন স্বরূপ দিলে ফেৎরা আদায় হইবে না।

রোযার ফযীলত

১। হাদীস ঃ রসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, রোযাদারের নিদ্রা এবাদতের সমতুল্য, তাহার চুপ থাকা তস্‌বীহ্‌ পড়ার সমতুল্য, সে সামান্য ইবাদতে অন্য সময় অপেক্ষা রমযানের অনেক সওয়াবের অধিকারী হয়, তাহার দো'আ কবূল হয় এবং গোনাহ্‌ মা'ফ হয়।' (রোযার বরকতে এই সব ফবীলত হাছেল হয়।) —বায়হাকী

২। হাদীস ঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, 'দোযখের আগুন হইতে বাঁচিবার জন্য রোযা ঢাল এবং সুদৃঢ় প্রস্তর-প্রাচীর স্বরূপ' (অর্থাৎ, ঢাল ও সুদৃঢ় প্রস্তর-প্রাচীরের আশ্রয়ে যেমন শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা যায়, তদ্রূপ মানুষ শরীঅতের নিয়ম মত রোযা রাখিলে দোযখের আগুন হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে।) —বায়হাকী

এরূপে মানুষের গোনাহ্‌র প্রাবল্য হ্রাস পায় এবং নেকীর উৎস বৃদ্ধি পায়। কাজেই বাকায়দা রোযা রাখিলে এবং সূক্ষ্মভাবে রোযার আদব রক্ষা করিলে গোনাহ্‌ হ্রাস পায় এবং দোযখ হইতে নাজাত পায়।

৩। হাদীস ঃ হাদীস শরীফে আছে ঃ 'রোযা রোযাদারের জন্য ঢালস্বরূপ, যে পর্যন্ত উহাকে মিথ্যা এবং গীবতের দ্বারা নষ্ট করিয়া না ফেলে।' (অর্থাৎ, রোযা রাখিয়া মিথ্যা, গীবত, কটুবাক্য, ঝগ্‌ড়া-কলহ, গালাগালি এবং অন্যান্য পাপ হইতে বিরত না থাকিলে আইনতঃ রোযা হইবে বটে, কিন্তু মস্ত বড় গোনাহ্‌ হইবে এবং রোযার বরকত হইতে বঞ্চিত থাকিবে।) [দোযখ হইতে বাঁচিবার যোগ্য রোযা হইবে না।] —তাব্‌রানী

৪। হাদীস শরীফে আছেঃ 'রোযা দোযখের ঢালস্বরূপ।' অতএব, যে রোযা রাখিবে জাহেলদের ন্যায় অশ্লীল কোন কাজ করা বা কথা বলা তাহার উচিত নহে। যদি অন্য কেহ তাহার সহিত জাহেলদের ন্যায় অসভ্য ব্যবহার করে, তবে প্রতি উত্তরে তাহার অনুরূপ ব্যবহার করা সমীচীন নহে; বরং বলা উচিত, আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে রোযা রাখিয়াছি; রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আরও বলিয়াছেনঃ 'আমি সেই মহান আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিতেছি, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয় জানিও, আল্লাহ্‌র নিকট রোযাদারের মুখের বদ্‌বু মেশ্‌কের খোশবু অপেক্ষা অধিক প্রিয়। কিয়ামতের দিন রোযাদারকে মেশ্‌ক অপেক্ষা অধিক মূল্যবান খোশবু এই রোযার বদ্‌বুর পরিবর্তে দান করা হইবে। —নাসায়ী

৫। হাদীস শরীফে আছেঃ রোযাদার ব্যক্তিকে প্রত্যেক দিন ইফ্‌তারের সময় এমন একটি দো'আ চাহিয়া লওয়ার ইজাযত দেওয়া হয়, যাহা কবূল (মঞ্জুর) করিয়া লইবার বিশেষ ওয়াদা করা হইয়াছে।' —হাকেম

৬। হাদীস শরীফে আছেঃ একবার হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইজন লোককে বলিয়াছেনঃ তোমরা রোযা রাখ। জান না, রোযা দোযখ হইতে মুক্তি লাভ করিবার এবং বালা-মুছীবত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঢালস্বরূপ।' অর্থাৎ রোযার বরকতে আখেরাতে দোযখের আযাব হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে এবং দুনিয়াতে বালা-মুছীবত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। —ইবনোন্নাজ্জার

৭। হাদীসঃ রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ কিয়ামতের দিন তিনজন লোকের খাওয়া-দাওয়ার হিসাব দিতে হইবে না। অবশ্য হালাল খাদ্য হওয়া চাই—(১ম) রোযার ইফ্‌তার করিতে যাহাকিছু খায়। (২য়) যে রোযার সেহ্‌রী খায়। (৩য়) যে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ইসলামী রাজ্যের সীমান্তে পাহারা দেয়। (এই তিন প্রকার লোকের খানার হিসাব যে মা'ফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা আল্লাহ্ তা'আলার অতি বড় অনুগ্রহ। (অনুগ্রহের দান পাইয়া দাতাকে ভুলিয়া যাওয়া ঠিক নহে; বরং দাতার আরও অধিক অনুগত, তাবে'দার ও ফরমাঁবরদার হওয়া উচিত।) এই হাদীসে উক্ত তিন প্রকার লোকের প্রতি আল্লাহ্‌র বড় অনুগ্রহ বলিয়া প্রমাণিত হইল যে, তাহাদের খাওয়ার হিসাব মা'ফ করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এই অনুগ্রহের কারণে অতিমাত্রায় সুস্বাদু খাদ্য খাওয়ায় লিপ্ত হওয়া উচিত নহে। অতিরিক্ত আয়েশ আরামে লিপ্ত হইলে আল্লাহ্‌র কথা ভুলিয়া যায় এবং গোনাহ্‌র শক্তি বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্‌র এই নেয়ামতের কদর করা উচিত। বেশী এবাদত করিয়া এই নেয়ামতের শোক্‌র করিবে।

৮। হাদীস শরীফে আছেঃ যে রোযাদারকে ইফ্‌তার করাইবে, সে ঐ রোযাদারের সওয়াবের সমান সওয়াব পাইবে, অথচ রোযাদারের সওয়াব কম হইবে না। ইফ্‌তার যতই সামান্য জিনিসের দ্বারা করান হউক না কেন, যেমন পানি দ্বারা, তবুও ঐ প্রকার পূর্ণ সওয়াব পাইবে (এবং ইফ্‌তারে যে খানা খাওয়ান হয় তাহাতেও ঐ প্রকার সওয়াব হইবে।) —আহ্‌মদ

৯। হাদীসঃ রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেনঃ 'মানুষের যত প্রকার নেকী বা নেক কাজ আছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সওয়াব দশগুণ হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ কিন্তু রোযা। (অর্থাৎ, রোযা এই নিয়মের বহির্ভূত, রোযার সওয়াব এইভাবে সীমাবদ্ধ নহে, আরও অনেক বেশি। কারণ, রোযা খাছ আমার জন্য, রোযার সওয়াব ও পুরস্কার স্বয়ং আমি নিজ হাতে দিব।) ইহা দ্বারা রোযার সওয়াবের গুরুত্ব অনুমান করা উচিত, যাহার

কোন হিসাবই জানা নাই যে, ইহার সওয়াব কত? অন্যান্য আমলের পুরস্কার ফেরেশ্‌তাদের মারফত প্রদত্ত হইবে। রোযার পুরস্কার স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন নিজ হাতে দিবেন। ইহার দ্বারা ফযীলত হাছেল করিতে হইলে রোযার হক্ আদায় করিতে হইবে। (অর্থাৎ, মিথ্যা, গীবত, ঝগ্‌ড়া-ফ্যাসাদ, কটুবাক্য, গালাগালি, পরের অনিষ্ট, ঘুষ, সুদ ইত্যাদি পাপ কাজ হইতে রোযাকে পবিত্র রাখিতে হইবে, নতুবা এইসব ফযীলত হাছেল হইবে না। অনেকে রোযার দিনে ফজরের নামায বেলা উঠিলে পড়ে; অনেকে পড়েই না। ইহারা এরূপ বরকত এবং সওয়াব পাইবে না। এই হাদীস হইতে এই সন্দেহ যেন না হয় যে, নামায হইতেও রোযা উত্তম। কেননা, নামায সকল ইবাদত হইতে শ্রেষ্ঠ। সারকথা, রোযার সওয়াব অনেক বেশী। নিশ্চয় রোযাদারের জন্য দুইটি খুশী। একটি হইল ইফ্‌তারের সময়, দ্বিতীয়টি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সাক্ষাতের সময়। হাদীসে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। —খতীব

১০। হাদীস শরীফে আছেঃ 'রমযান শরীফের প্রথম রাত্রি যখন আসে তখনই আসমানের সমস্ত দরজা খুলিয়া দেওয়া হয় এবং রমযান শরীফের শেষ রাত্রি পর্যন্ত ঐ সকল দরজা খোলা থাকে (মু'মিন বান্দাগণের নেক আমল উঠাইবার জন্য এবং তাহাদের উপর রহ্‌মত নাযিল করিবার জন্যই ঐ সকল দরজা খোলা রাখা হয়) এবং রমযান শরীফের রাত্রিতে কোন মু'মিন বান্দা খাঁটিভাবে কিছু নামায পড়িলে, প্রত্যেক রাকা'আতের পরিবর্তে তাহাকে আড়াই হাজার (গুণ) সওয়াব দেওয়া হইবে এবং তাহার জন্য বেহেশ্‌তে লাল মণিমুক্তা দ্বারা এমন একটি অট্টালিকা নির্মাণ করা হইবে যাহার ৬০টি দরজা হইবে এবং প্রত্যেক দরজার সামনে লাল মুক্তা দ্বারা সুসজ্জিত একটি স্বর্ণের কামরা থাকিবে। যে ব্যক্তি রমযান শরীফের প্রথম তারিখে খাঁটিভাবে রোযা রাখে, তাহার গত রমযানের তারিখ হইতে এই তারিখ পর্যন্ত যত (ছগীরা) গোনাহ্ হইয়াছে, সব মা'ফ করিয়া দেওয়া হয় এবং আল্লাহ্‌র নিকট মাগ্‌ফেরাত চাহিবার জন্য প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত করা হয়। তাহারা তাহার জন্য ফজরের নামাযের পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দো'আ করিতে থাকে। রমযান শরীফের দিনে বা রাত্রে মু'মিন বান্দা যে সকল নামায পড়িবে, তাহার প্রত্যেক রাকা'আতের বরকতে বেহেশ্‌তের মধ্যে তাহার জন্য প্রকাণ্ড একটি বৃক্ষ উৎপন্ন করা হইবে—যাহার ছায়ায় সোয়া পাঁচশত বৎসর ভ্রমণ করা যায়।' (দেখুন, রোযার কত বড় ফযীলত! আল্লাহ্‌র কি অপার মহিমা! কি অসীম দয়া মু'মিন বান্দাদের প্রতি! সামান্য কষ্টের পরিবর্তে কত অধিক পুরস্কার তিনি নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন! হে মুসলমান ভাই-বোনগণ! কখনও রোযা ক্বাযা করিও না। সাহস থাকিলে নফল রোযাও রাখিও। আল্লাহ্‌র সহিত পুরাপুরিভাবে মহব্বত রাখ। যিনি এত দয়া করিয়াছেন যে, সামান্য পরিশ্রমে বিপুল সওয়াব দান করিয়াছেন, অন্ততঃ নিজ স্বার্থের জন্য আল্লাহ্‌কে প্রিয় বানাও, যিনি বেহেশ্‌তে বড় বড় নেয়ামত দান করিবেন। অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী কিছু বেশী এবং ভাল করিয়া করিবার জন্য, বিশেষতঃ গোনাহ্‌র কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া যাও, তবেই দেখিতে পাইবে, যে আল্লাহ্‌র দয়া কত বেশী! আমরা নিজেরাই পাপে ডুবিয়া খোদা হইতে দূরে সরিতে থাকি, তাই তাঁহার দয়ার কারিগরি দেখিতে পাই না।)

১১। হাদীস শরীফে আছেঃ রমযান শরীফের উদ্দেশ্য বৎসরের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত বেহেশ্‌তকে সাজান হইতে থাকে এবং বেহেশ্‌তের হূরগণ (অতীব সুন্দরী রমণীরা) রোযাদারদের জন্য বৎসরের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত অনুপম বেশভূষায় নিজেদেরে সাজাইতে থাকে। যখন

রমযান শরীফ আসে, তখন বেহেশ্‌ত বলিতে থাকেঃ হে, আল্লাহ্ পাক! আপনি আপনার নেক বান্দাদিগকে আমার ভিতরে প্রবেশাধিকার দান করুন অর্থাৎ এমন হুকুম লিখিয়া দিন, যাহাতে কিয়ামতের দিন তাহারা আমার ভিতর স্থান পাইতে পারে এবং বড় বড় চোখওয়ালা হূরগণ বলেঃ 'হে আল্লাহ্ পাক! এই পবিত্র মাসে আপনার নেক বান্দাগণ হইতে আমাদের জন্য স্বামী নির্ধারিত করিয়া দিন। যে ব্যক্তি এই পবিত্র মাসে কোন মুসলমানের উপর কোনরূপ দোষারোপ করিবে না এবং নেশা পান করিবে না, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সমস্ত (ছগীরা) গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দিবেন। পক্ষান্তরে যে এই পবিত্র মাসে কোন মুসলমানের উপর কোনরূপ দোষারোপ করিবে। (গীবত, শেকায়েত, মিথ্যা অপবাদ, গালি ইত্যাদি) অথবা নেশা পান করিবে, তাহার সারা বৎসরের ইবাদত-বন্দেগী মুছিয়া ফেলা হইবে। (অর্থাৎ, বেশী গোনাহ্ হইবে। কেননা, পবিত্র মাসে নেক কাজ করিলে যেমন বেশী সওয়াব পাওয়া যাইবে, তদ্রূপ গোনাহ্ করিলেও বেশী শাস্তি হইবে। ভাবিয়া দেখ, ইহাতে কত বড় ধমকি নিহিত আছে।) হযরত (দঃ) বলিলেনঃ 'অতএব, হে আমার উম্মৎগণ! তোমরা রমযান শরীফ সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকিও। কারণ, উহা আল্লাহ্‌র খাছ পবিত্র মাস। (যদিও সব মাসই আল্লাহ্‌র কিন্তু পানাহার বর্জন আল্লাহ্‌র চিরাচরিত অভ্যাস। এই মাসে আল্লাহ্ পাক স্বীয় বান্দাগণকে আংশিকভাবে তাঁহার অনুকরণের অভ্যাস করাইতে এবং অনেক বেশী সম্মান দান করিতে চান। কাজেই এই মাসের অধিক মর্যাদা দেখাইবার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে এই মাসকে আল্লাহ্‌র মাস বলা হইয়াছে।) হে আমার উম্মৎগণ! এগার মাস আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে পানাহারের জন্য দিয়াছেন, এক মাস পানাহার বর্জন দ্বারা নিজের জন্য খাছ করিয়া লইয়াছেন। অতএব, তোমাদিগকে আমি অছিয়ত করিতেছি যে, তোমরা রমযান শরীফ সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকিও। খবরদার! রমযান শরীফের মর্যাদা রক্ষায় কেহ ত্রুটি করিও না। এই মাস আল্লাহ্‌র খাছ পবিত্র মাস। [আল্লাহ্‌র ইবাদত সব সময়ই করিবে, গোনাহ্ হইতে সব সময়েই বাঁচিয়া থাকিবে, কিন্তু পবিত্র স্থানে (যেমন, মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ বা মসজিদ) এবং পবিত্র কালে (যেমন, রমযান শরীফ, জুমু'আর দিন, শবে-বরাত, সবে-ক্বদর, হজ্জের দিন ইত্যাদি) নেক কাজ করিলে তাহার সওয়াব অনেক বেশী পাওয়া যায়, সেইরূপ গোনাহ্ করিলে তাহার পাপ এবং শাস্তিও অনেক বেশী হয়।]

ইফ্‌তারের দো'আ

১২। হাদীস শরীফে আছে, রোযাদারের সামনে যখন আল্লাহ্‌র নেয়ামত আসে অর্থাৎ, ইফ্‌তারের জন্য কোন খাদ্যদ্রব্য আসে, তখন তাহার এইরূপ বলিয়া আল্লাহ্‌র নেয়ামতের শোক্‌র আদায় করা উচিতঃ

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ تَقَبَّلْ مِنِّيْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

অর্থঃ আল্লাহ্‌রই নামে আরম্ভ করি এবং আল্লাহ্‌রই প্রশংসা করি। আয় আল্লাহ্! তোমারই উদ্দেশ্যে আমি রোযা রাখিয়াছিলাম এবং তোমারই নেয়ামতের দ্বারা ইফ্‌তার করিতেছি এবং তোমারই উপর আমার ভরসা। তুমি পবিত্র। তুমি প্রশংসনীয়। আমার রোযা কবূল কর। তুমি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ। —দারাকুতনী

১৩। হাদীসঃ 'তোমরা যখন ইফ্‌তার কর, খোরমার দ্বারা ইফ্‌তার করা ভাল। কেননা, খোরমার মধ্যে বরকত আছে। আর যদি খোরমা না পাওয়া যায়, তবে পানির দ্বারা ইফ্‌তার করা ভাল, কেননা, পানি পবিত্রকারী।' কোন কোন হাদীসে পানি মিশ্রিত দুধের দ্বারা ইফ্‌তার করার হুকুমও আসিয়াছে। —ইব্‌নে খোযায়মা

১৪। হাদীস শরীফে আছে, যে মুসলমান খালেছ নিয়তে ৪০টি রোযা রাখিবে, সে আল্লাহ্‌র কাছে যাহা চাহিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে তাহাই দান করিবেন। খালেছ নিয়তের অর্থ এই যে, রোযার মধ্যে শুধু মাত্র আল্লাহ্‌কে রাযী করাই উদ্দেশ্য হওয়া চাই, অন্য কোন উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। এইরূপ ৪০টি রোযা রাখিতে পারিলে সে আল্লাহ্‌র নিকট এত প্রিয়পাত্র হইয়া যায় যে, আল্লাহ্ পাক তাহার প্রত্যেক দো'আই কবূল করেন, অর্থাৎ যে দো'আ তাহার জন্য কল্যাণকর হইবে তাহা নিশ্চয়ই কবূল হইবে। ছুফীয়ায়ে কেরাম যে চিল্লাকাশী দ্বারা নফ্‌সকুশী করিয়া মা'রেফাৎ হাছেল পূর্বক খোদার নৈকট্য লাভ করেন, এই হাদীসই তাঁহাদের দলীল। 'চিল্লাকাশীর' অর্থ ৪০ দিন পর্যন্ত দুনিয়ার সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া রোযা রাখিয়া কোন মসজিদে গিয়া পড়িয়া থাকা এবং দিন রাত তথায় ইবদাত-বন্দেগীতে এবং আল্লাহ্‌র যেকেরে মগ্ন থাকা। এইরূপ করিতে পারিলে নৈকট্য লাভ হয়, (তবে পীরে কামেলের পরামর্শ ও উপদেশ নিয়া করিলে বেশী ফল পাওয়া যায়। নফ্‌সকুশীর অর্থ—মানুষের অন্তরের কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও অহঙ্কার ইত্যাদি রিপুগুলিকে দমন করিয়া আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হওয়া।) —দায়লামী

১৫। হাদীস শরীফে আছে, 'আশ্‌হোরে হোরোমের প্রত্যেক বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবারে যে রোযা রাখিবে, তাহার জন্য আল্লাহ্ পাক সাত শত বৎসরের ইবাদতের সমান নেকী লিখিবেন। ['আশ্‌হোর' ' শাহ্‌র' শব্দের বহুবচন। শাহ্‌র অর্থ মাস 'হোরম' 'হারামের' বহুবচন। 'হারাম' অর্থ যাহাকে সম্মান দান করা হইয়াছে এবং যাহার সম্মান করা কর্তব্য। 'হারাম' অর্থ কঠোরভাবে নিষিদ্ধও আছে; এখানে সে অর্থও লওয়া যাইতে পারে। রজব, যিলক্বদ্, যিলহজ্জ এবং মুহার্‌রাম এই চারিটি মাসকে আল্লাহ্ তা'আলা আদিকাল হইতে সম্মান দান করিয়া রাখিয়াছেন এবং লোকদিগকে ইহার সম্মান করার জন্য আদেশ করিয়াছেন এবং এই চারি মাসে পাপ কার্য করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন, কাজেই এই চারি মাসকে 'আশ্‌হোরে হোরোম অর্থাৎ সম্মানিত মাস বলা হয়। প্রকাশ থাকে যে, যিলহজ্জ মাসের ১০ই, ১১ই, ১২ই এবং ১৩ই তারিখে রোযা নিষেধ।] —ইব্‌নে শাহীন

১৬। হাদীস শরীফে আছে, 'যে ব্যক্তি আশ্‌হোরে হোরোমের কোন এক মাসে বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনিবার এই তিন দিন রোযা রাখিবে তাহার জন্য আল্লাহ্ পাক দুই বৎসরের ইবাদতের সমান নেকী লিখিয়া দিবেন।' (অর্থাৎ, এখন আমলনামার মধ্যে লেখা হইবে, কিয়ামতের দিন বেহেশ্‌তে এই তিনটি রোযার বরকতে দুই বৎসরের নফল ইবাদতের সমান পুরস্কার দেওয়া হইবে।) —তাব্‌রানী

শবে ক্বদরের ফযীলত

১। আয়াতঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ 'শবেক্বদরের এক রাত্রি এক হাজার মাস হইতে শ্রেষ্ঠ।' অর্থাৎ অন্যান্য সময় এক হাজার মাস এবাদত-বন্দেগী

করিয়া যত সওয়াব পাওয়া যাইবে, শবে-ক্বদরের এক রাত্রিতে ইবাদত করিয়া তদপেক্ষা অধিক সওয়াব পাওয়া যাইবে।

আল্লামা সয়ুতি লুবাবুনু নুকূল গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ রসূল (দঃ) বলিয়াছেন, বনী ইস্‌রায়ীল কওমের এক ব্যক্তি এক হাজার মাস আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদে কাটাইয়াছিল। ইহা শুনিয়া মুসলমানগণ বিস্মিত হইল। এবং আফ্‌সোস করিতে লাগিল যে, আমরা কিরূপে এমন নেয়ামত পাইতে পারি। তখন এই আয়াত নাযিল হয়ঃ

اِنَّآ اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ـ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ـ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ○

ঐ ব্যক্তি যে হাজার মাস আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদ করিয়াছিল, শবে-ক্বদর উহা হইতে উত্তম। অন্য এক রেওয়ায়তে আছে, বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি রাত্রে ভোর পর্যন্ত এবাদত করিত। আর সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধর্মের দুশ্‌মনদের সহিত যুদ্ধ করিত। এক হাজার মাস কাল এইরূপ করিয়াছিল। এই কাহিনী শুনিয়া হযরত ছাহাবা কেরাম আফসোস করেন। তখন উক্ত আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তির হাজার মাস এবাদত ও জেহাদ হইতে এই রাত্রি উত্তম।

ভাই-বোনগণ! এই মোবারক রাত্রির ক্বদর কর। সামান্য পরিশ্রমে কত বেশী সওয়াব পাওয়া যায়! বিশেষ করিয়া এই রাত্রে দো'আ কবূল হয়। যদি পূর্ণ রাত্রি জাগিতে না পার, তবে যতটুকু সম্ভব জাগিয়া থাক। হিম্মতহারা হইয়া একেবারে মাহ্‌রূম থাকিও না।

২। হাদীস শরীফে আছে, হযরত (দঃ) রমযান সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ 'তোমাদের নিকট এমন একটি মাস আসিয়াছে, যাহাতে এমন একটি রাত্র আছে যাহার মূল্য এক হাজার মাস হইতেও অধিক।' যে ব্যক্তি এই রাত্রের ফযীলত ও বরকত হাছেল না করিবে, সে সমস্ত খায়ের-বরকত হইতে মাহ্‌রূম হইবে। বস্তুতঃ এই রাত্রে যে কিছুমাত্র ইবাদত-বন্দেগী করে না, তাহার চেয়ে দূরদৃষ্ট কেহই নাই।

৩। হাদীস শরীফে আছে, 'বিশেষ কোন হেকমতের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে শবে-ক্বদরের রাতটি নির্দিষ্ট করিয়া জানাইয়া দেন নাই। অতএব, তোমরা রমযান শরীফের শেষের সাত রাত্রিতে উহাকে তালাশ কর।' অর্থাৎ, এই রাতগুলিতে জাগিয়া আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগীতে মশ্‌গুল থাক। —হাকেম

৪। হাদীস শরীফে আছে, শবে-ক্বদর প্রত্যেক রমযানেই হয় এবং ইহাও হাদীসে আছে, যে রমযানের ২৭শে শবে-ক্বদর হয়। —আবু দাউদ

শবে-ক্বদরের তারিখ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে, কিন্তু ২৭শে রাত্রে যে শবে-ক্বদর হয় ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক মশ্‌হুর ক্বওল। উত্তম যে, শক্তি ও সাহস হইলে শেষ দশটি রাত্র জাগিবে। (বিশেষতঃ ইহার মধ্যে বেজোড় রাতগুলিতে অধিক পরিমাণে এবাদত-বন্দেগী এবং খোদার দিকে রুজু হওয়া উচিত।) অনেকে মনে করে যে, আলো বা কোন কিছু হয়ত এই রাত্রিতে দেখা যায়; কিন্তু কোনকিছু দেখা যাওয়া যরূরী নহে, মনে-প্রাণে ইবাদত করিলেই এই রাত্রের বরকত হাছেল হইবে।

তারাবীহ্ নামাযের ফযীলত

১। হাদীসঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ ('হে আমার পেয়ারা উম্মতগণ।) তোমরা নিশ্চয় জানিও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর রমযান শরীফের (দিনের বেলায়) রোযা ফরয

করিয়াছেন এবং (তোমাদের উপকারের জন্য) উহার রাত্রে তারাবীহ্‌র নামায সুন্নত করিয়াছেন। অতএব, যে ব্যক্তি খালেছ নিয়তে, ঈমানের সহিত, শুধু সওয়াবের আশায় (অন্য কোন আশায় নহে, অমনোযোগিতা বা অভক্তির সহিত নহে) এই মাসে দিনের বেলায় রীতিমত রোযা রাখিবে এবং রাত্রিতে রীতিমত তারাবীহ্‌র নামায পড়িবে, তাহার বিগত সব (ছগীরা) গোনাহ্‌ (এই দুইটি আমলের বরকতে) মিটাইয়া দেওয়া হইবে।' অতএব, এই পবিত্র মাসে অধিক নেকী সঞ্চয় করিয়া লওয়া উচিত। এই মাসের একটি ফরয অন্য মাসের ৭০টি ফরযের সমান এবং একটি নফল এবাদত করিলে একটি ফরযের সমান নেকী পাওয়া যায়।

দুই ঈদের রাত্রের ফযীলত

১। হাদীসঃ রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেনঃ 'যে ব্যক্তি ঈদুল ফেতর ও ঈদুল আযহার রাত্রে জাগরিত থাকিয়া আল্লাহ্‌র এবাদত-বন্দেগীতে মশ্‌গুল থাকিবে, যে দিন অন্যান্য দেল মরিবে, সে দিন তাহার দেল মরিবে না অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের আতঙ্কে অন্যান্য লোকের দেল ঘাবড়াইয়া মৃতপ্রায় হইয়া যাইবে; কিন্তু দুই ঈদের রাত্রে জাগরণকারীর দেল তখন ঠিক থাকিবে, ঘাবড়াইবে না।' —তাব্‌রানী

আশুরা রোযা—(বর্ধিত)

১। হাদীসঃ হাদীস শরীফে আছেঃ 'রমযানের রোযার পর আশুরার রোযার মর্তবা সবচেয়ে বড়। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, আশুরার রোযা দ্বারা আমি আশা করি যে, বিগত এক বৎসরের (ছগীরা) গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। মুহার্‌রাম মাসের ১০ই তারিখকে "আশুরা" বলে। কিন্তু হাদীস শরীফে আছে যে, আশুরার রোযা রাখিতে হইলে তাহার আগে বা পরেও একটি রোযা রাখিবে, যাহাতে ইহুদীদের অনুকরণের দোষারোপ না আসে। কারণ, ইহুদীরা শুধু ১০ই তারিখে রোযা রাখে। —মুসলিম

হাদীস শরীফে ইহাও আছে যে, 'আশুরার দিন যে ব্যক্তি নিজের পরিবারবর্গকে আছুদা করিয়া খাইবার ও পরিবার দিবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে সারা বৎসর আছুদা করিয়া খাইবার ও পরিবার দিবেন।' —বায়হাকী

রজবের রোযা

১। হাদীসঃ 'রজব মাস আশ্‌হোরে হোরোমের অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশের মতে এই মাসের ২৫শে রাত্রেই মে'রাজ হইয়াছিল। কিন্তু এই রাত্রিকে একটি উৎসবের রাত্রি বা ঐ দিনের রোযাকে যরূরী মনে করিবে না।

শবে বরাত

১। হাদীসঃ 'হাদীস শরীফে আছে, শা'বানের চাঁদের ১৫ই রাত্রে (অর্থাৎ ১৪ই দিবাগত রাত্রে) সারা বৎসরের হায়াত, মওত, রেযেক ও দৌলত লেখা হয় এবং ঐ রাত্রে বান্দাগণের আমল খোদার দরবারে পেশ করা হয়।' হযরত নবী আলাইহিস্‌সালাম স্বীয় উম্মতগণকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, 'শা'বানের চাঁদের ১৫ই রাত্রে তোমরা জাগরিত থাকিয়া আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী করিও

এবং দিনের বেলায় রোযা রাখিও।' কেননা, ঐ রাত্রিতে বান্দাগণের প্রতি আল্লাহ্ পাকের খাছ রহ্মতের দৃষ্টি হয়। এমনকি, আল্লাহ্ পাক সূর্যাস্তের পর হইতে ছোব্হে ছাদেক পর্যন্ত দুনিয়ার আকাশে আসিয়া দুনিয়াবাসীদের জন্য ঘোষণা করিতে থাকেন যে, তোমাদের মধ্যে যাহার গোনাহ্ মা'ফ করাইয়া লওয়া দরকার থাকে মা'ফ চাহিয়া লও, আমি মা'ফ করিবার জন্য প্রস্তুত আছি। তোমাদের মধ্যে যাহার রেযেকের দরকার থাকে, রেযেক চাহিয়া লও, আমি দিবার জন্য প্রস্তুত আছি। তোমাদের মধ্যে যাহার রোগ আরোগ্য বা বিপদ হইতে মুক্তি চাহিয়া লওয়ার দরকার থাকে চাহিয়া লও, আমি রোগ আরোগ্য করিবার এবং বিপদ হইতে মুক্তি দিবার জন্য প্রস্তুত আছি। এইরূপে বান্দাদের এক এক অভাবের নাম লইয়া আল্লাহ্ পাক ছোব্হেছাদেক পর্যন্ত ঘোষণা করিতে থাকেন। হায়! রহ্মানুররাহীম আহ্কামুল হাকেমীনের পক্ষ হইতে এমন ঘোষণার সুবর্ণ সুযোগ যাহারা হেলায় হারায় বরং আতশবাজি, ঝগড়া, বিবাদ ইত্যাদি করিয়া যাহারা পাপের আগুন বাড়ায় তাহাদের চেয়ে হতভাগা বদনছীব আর কে? হাদীস শরীফে ইহাও আছে যে, হযরত নবী আলাইহিস্সালাম এই রাত্রে কবরস্তানে গিয়া মৃত মুসলমানদের জন্য দো'আয়ে-মাগফেরাত করিতেন। কাজেই এই রাত্রিতে যদি কিছু দান-খয়রাত করিয়া বা কিছু নফল নামায বা কলেমা কালাম পড়িয়া উহার সওয়াব মৃতদের বখ্শিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদের মুক্তি ও মাগফেরাতের দো'আ করা হয়, তবে তাহা অতি উত্তম। এতদ্ব্যতীত অতিরিক্ত বাতি জ্বালাইয়া বা আতশবাজি পোড়াইয়া আমোদ-উৎসব করা ইসলামী তরীকার বিরুদ্ধ কাজ। হযরত (দঃ) ইহাও বলিয়াছেনঃ শির্ক করা, আত্মীয়দের সহিত অসদ্ব্যবহার করা এবং মুসলমানে মুসলমানে পরস্পর শত্রুতা পোষণ করা, এই তিন প্রকার গোনাহ্ ছাড়া অন্যান্য গোনাহ্ আল্লাহ্ পাক মা'ফ করিয়া দেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, যাদুকর, নজুমী, বখীল, নেশা, লেওয়াতাতকারী এবং পিতামাতার অবাধ্য সন্তান ব্যতীত অন্য সকলের গোনাহ্ মাফ করিয়া দেন।

যাকাত

মালদার হওয়া সত্ত্বেও যে যাকাত না দিবে সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ভীষণ পাপী এবং গোনাহ্গার হইবে এবং কিয়ামতের দিন তাহার কঠোর শাস্তি এবং ভীষণ আযাব ভোগ করিতে হইবে।

হাদীস শরীফে আছেঃ 'যাহার নিকট সোনা, রূপা মওজুদ থাকা সত্ত্বেও সে তাহার যাকাত দেয় নাই, কিয়ামতের দিন তাহাকে আযাব দিবার জন্য ঐ সোনা রূপার পাত বানান হইবে এবং ঐ পাতগুলি দোযখের আগুনে দগ্ধ করিয়া তাহার বুকে, পিঠে, পাঁজরে এবং কপালে দাগ দেওয়া হইবে। পাতগুলি একবার ঠাণ্ডা হইয়া গেলে পুনর্বার উত্তপ্ত করিয়া লওয়া হইবে।'

অন্য হাদীসে আছেঃ 'যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা মাল দিয়াছেন, সে কিন্তু উহার যাকাত আদায় করে নাই। (লোভের বসে মাটির নীচে, সিন্দুকের মধ্যে বা ব্যাঙ্কে জমা করিয়া রাখিয়াছে) কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র হুকুমে ঐ মালের দ্বারা অতি বিষাক্ত সাপ বানান হইবে এবং সেই সাপ ঐ ব্যক্তির গলা পেঁচাইয়া ধরিয়া উভয় গালে দংশন করিবে এবং বলিবেঃ 'আমি তোমার টাকা, আমিই তোমার সঞ্চিত ধন।'

'আল্লাহ্‌র পানাহ্ চাই।' জাব্বার কাহ্হার আল্লাহ্‌র আযাব সহ্য করিবার ক্ষমতা কাহার আছে? সামান্য লোভের বশীভূত হইয়া মানুষ যেন এমন পাপ কখনও না করে। হে মানুষ! আল্লাহ্‌রই দান করা ধন, (দিয়া ধন বুঝে মন।) আল্লাহ্‌র পক্ষে দান না করা কত বড় অন্যায় কথা।

১। মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি ৫২।।০ তোলা রূপা, অথবা ৭।।০ তোলা সোনার কিংবা তৎমূল্যের টাকার মালিক হয় এবং তাহার নিকট ঐ পরিমাণ মাল পূর্ণ এক বৎসরকাল স্থায়ী থাকে, তাহার উপর যাকাত ফরয হয়। ইহা অপেক্ষা কম হইলে যাকাত ফরয নহে। ইহা অপেক্ষা বেশী হইলেও যাকাত ফরয হইবে। এই মালকে 'নেছাব' বলে এবং যে এই পরিমাণ মালের মালিক হয়, তাহাকে 'মালেকে নেছাব' বা 'ছাহেবে নেছাব' বলা হয়।

২। মাসআলা ঃ যদি কাহারও নিকট ৭।।০ তোলা সোনা বা ৫২।।০ তোলা রূপা ৪/৫ মাস থাকে, তারপর কম হইয়া যায় এবং ২/৩ মাস কম থাকে, তারপর আবার নেছাব পূর্ণ হইয়া যায়, তবে তাহার যাকাত দিতে হইবে। মোটকথা, বৎসরের শুরু এবং শেষ দেখিতে হইবে, বৎসরের শুরুতে যদি মালেকে নেছাব হয় এবং বৎসরের শেষেও মালেকে নেছাব হয়, মাঝখানে কিছু কম হইয়া যায়, তবে বৎসরের শেষে তাহার নিকট যত টাকা থাকিবে, তাহার যাকাত দিতে হইবে। অবশ্য বৎসরের মাঝখানে যদি তাহার সম্পূর্ণ মাল কোন কারণে নষ্ট হইয়া যায়, তবে পূর্বের হিসাব বাদ দিয়া পুনরায় যখন নেছাবের মালিক হইবে, তখন হইতে হিসাব ধরিতে হইবে, তখন হইতেই বৎসরের শুরু ধরা হইবে।[১]

৩। মাসআলা ঃ কাহারও নিকট ৮/৯ তোলা সোনা ছিল, কিন্তু পূর্ণ বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই তাহা তাহার হাত ছাড়া হইল, (চুরি হইয়া গেল বা হারাইয়া গেল, বা দান করিয়া ফেলিল,) এমতাবস্থায় তাহার উপর যাকাত ওয়াজিব হইবে না।

৪। মাসআলা ঃ কাহারও নিকট ২০০ টাকা আছে, কিন্তু আবার ২০০ টাকা করযও আছে, এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব হইবে না; পূর্ণ বৎসর থাকুক বা না থাকুক। আর যদি ১৫০ টাকাও করয হয়, তবুও যাকাত ওয়াজিব হইবে না। কেননা, ১৫০ টাকা বাদ দিলে মাত্র ৫০ টাকা থাকে। ৫০ টাকায় নেছাব পুরা হয় না। কাজেই যাকাত ওয়াজিব হইবে না।

৫। মাসআলা ঃ যদি কাহারও নিকট ২০০ টাকা থাকে এবং ১০০ টাকার করয থাকে, তবে ১০০ টাকার যাকাত দিতে হইবে।

৬। মাসআলা ঃ সোনা এবং রূপা যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, মাটির নীচে পোঁতা থাকুক, কারবারের মধ্যে থাকুক (নোটের পরিবর্তে) গভর্ণমেন্টের যিম্মায় বা অন্য কাহারও নিকট করয হিসাবে থাকুক, যেওর আকারে থাকুক এবং উহা ব্যবহারে থাকুক বা আজীবন বাক্সে তোলা থাকুক, কাপড়ে, টুপিতে, তলোয়ারে বা জুতায় কারুকার্যরূপে থাকুক, সব অবস্থায়ই নেছাব পরিমাণ পূর্ণ হইলে এবং এক বৎসরকাল মালিকের অধিকারে থাকিলে তাহাতে যাকাত ফরয হইবে; (অবশ্য যদি নেছাব পরিমাণ না হয়, বা পূর্ণ এক বৎসরকাল মালিকের নিকট না থাকে, তবে যাকাত ফরয হইবে না। সোনা এবং রূপা ব্যতিরেকে অন্য কোন ধাতুতে তেজারত না করা পর্যন্ত উহাতে যাকাত ফরয হইবে না।)

টিকা

১ বালেগ হওয়ার যাকাত, ফরয ও ইদ্দত পালনের কাল চাঁদ মাসের হিসাবে হয়।

৭। **মাসআলা ঃ** সোনা এবং রূপা যদি খাঁটি না হয় অন্য কোন ধাতু তাহাতে মিশ্রিত থাকে (মুদ্রা হউক, জেওর হউক বা অন্য বস্তু হউক) তবে দেখিতে হইবে যে, বেশীর ভাগ সোনা বা রূপা কি না? যদি বেশীর ভাগ সোনা বা রূপা হয়, তবে সম্পূর্ণ রূপা বা সোনা ধরিয়া লইতে হইবে এবং নেছাব পরিমাণ পূর্ণ হইলে হিসাব করিয়া তাহার যাকাত দিতে হইবে। আর যদি সোনার বা রূপার ভাগ কম হয় অন্য ধাতু (রাং বা দস্তা ইত্যাদি) বেশি হয়, তবে তাহাতে শুধু নেছাব পরিমাণ হইলে যাকাত ওয়াজিব হইবে না, অবশ্য এই মাল দ্বারা তেজারত করিলে, তেজারতের হিসাবে যাকাত দিতে হইবে।

৮। **মাসআলা ঃ** যদি কিছু সোনা এবং কিছু রূপা থাকে, কিন্তু পৃথকভাবে সোনার নেছাবও পূর্ণ হয় না, রূপার নেছাবও পূর্ণ হয় না, তবে উভয়ের মূল্য যোগ করিলে যদি নেছাব পরিমাণ অর্থাৎ ৫২৷৷০ তোলা রূপা অথবা ৭৷৷০ সোনার মূল্যের সমান হয়, তবে যাকাত ফরয হইবে; নতুবা যাকাত ফরয হইবে না। আর যদি উভয়টার নেছাব পূর্ণ থাকে, তবে মূল্য ধরিয়া যোগ করার আবশ্যক নাই।

৯। **মাসআলা ঃ** ধরুন ২৫ টাকায় এক ভরি সোনা পাওয়া যায় আর এক টাকায় দেড় তোলা চাঁদি পাওয়া যায়। এখন কাহারও নিকট দুই ভরি সোনা এবং পাঁচটি টাকা বেশী আছে এবং পূর্ণ এক বৎসর তাহার কাছে আছে। এখন তাহার উপর যাকাত ফরয হইবে। কেননা, দুই ভরি সোনা ৫০ টাকা; ৫০ টাকায় ৭৫ তোলা চাঁদি হইল। দুই ভরি স্বর্ণ দিয়া চাঁদি কিনিলে ৭৫ তোলা হইবে। আরও পাঁচ টাকা মওজুদ আছে। এই হিসাবে যাকাতের নেছাবের চেয়ে মাল অনেক বেশী হইল। অবশ্য যদি শুধু দুই তোলা সোনা থাকে উহার সহিত কোন চাঁদি বা টাকা না থাকে, তবে যাকাত ফরয হইবে না।

১০। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও নিকট ত্রিশ টাকা এক বৎসর কাল থাকে এবং ঐ সময় রূপার ভরি ৷৷০ বিক্রয় হয় এবং ত্রিশ টাকায় ৬০ ভরি রূপা পাওয়া যায়, তবুও তাহার উপর যাকাত ফরয হইবে না। কেননা, তাহার নিকট ত্রিশ টাকার মধ্যে ৩০ ভরি রূপাই আছে, যদিও উহার মূল্য ৬০ ভরি রূপা হয়; (অবশ্য ৬০ ভরি রূপা থাকিলে যাকাত ফরয হইবে, যদিও তাহার মূল্য ৩০ টাকা হয়।) কিন্তু শুধু সোনা বা শুধু রূপা থাকিলে তাহার মূল্যের হিসাব ধরা হয় না; ওজনের হিসাবই ধরা হয়।

১১। **মাসআলা ঃ** কেহ ১৬ই রজব তারিখে (হাজাতে আছলিয়া বাদে এবং করয বাদে) ১০০ টাকার মালিক হইল এবং রমযানে আরও ২০ টাকা লাভ পাইল, তারপর রবিউল আউয়ালে আরও ৩০ টাকা লাভ পাইয়া মোট ৫০ টাকা বাড়িল। এখন পর বৎসর ১৫ই রজব তারিখে হিসাব করিয়া দেখে যে (করয ও হাজাতে আছলিয়া বাদে) তাহার মবলগ ১৫০ টাকা আছে। এইরূপ হইলে ১৫ই রজব তারিখে তাহার উপর ১৫০ টাকারই যাকাত ফরয হইবে। ইহা বলা চলিবে না যে, পরে ৫০ টাকা লাভ করিয়াছে তাহার ত পূর্ণ এক বৎসর যায় নাই। কেননা, বৎসরের মাঝখানের কম বা বেশির হিসাব ধরা হয় না; হিসাব ধরা হয় বৎসরের শুরু ও শেষের।

১২। **মাসআলা ঃ** কেহ ১৫ই শওয়াল তারিখে মাত্র ১০০ তোলা রূপার মালিক ছিল (হাজাতে আছলিয়া এবং করয বাদে) তারপর বৎসরের মাঝখানে ২/৪ তোলা অথবা ৯/১০ তোলা সোনারও সে মালিক হইল, এইরূপ অবস্থা হইলে বৎসর যখন পূর্ণ হইবে অর্থাৎ পর বৎসর ১৪ই শওয়াল তারিখে তাহার সোনার এবং রূপার উভয়েরই যাকাত দিতে হইবে। এ বলা

যাইবে না যে, সোনার উপর এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই। কারণ, রূপার সঙ্গে সঙ্গে সোনার বৎসরও পূর্ণ ধরিতে হইবে।

১৩। মাসআলা ঃ সোনা এবং রূপা ব্যতিরেকে অন্য যত ধাতু আছে যেমন লোহা, তামা, পিতল, কাঁসা, রাং ইত্যাদি, অথবা কাপড়, জুতা, চিনাবাসন, কাঁচের বরতন ইত্যাদি যত আসবাব-পত্র আছে তাহার হুকুম এই যে, যদি এইগুলির কেনা-বেচার ব্যবসা করে, তবে নেছাব পরিমাণ হইলে বৎসরকাল স্থায়ী হইলে তাহার যাকাত দিতে হইবে; নতুবা ব্যবসা না করিয়া শুধু ঘরে রাখা থাকিলে, এইসব আসবাবপত্রের মূল্য হাজার টাকা হইলেও তাহার উপর যাকাত ফরয হইবে না।

১৪। মাসআলা ঃ ডেগ, ছিউনি (খাঞ্চা) লগন, বরতন ইত্যাদি, কোঠাঘর, বাড়ী, জমীন, কাপড়, শাড়ী, জুতা ইত্যাদি এবং মণিমুক্তার মূল্যবান হার; ফলকথা এই যে, সোনা এবং রূপা ব্যতিরেকে অন্য যত জিনিস আছে তাহা দৈনন্দিন ব্যবহারে আসুক বা শুধু ঘরে রাখা থাকুক, যে পর্যন্ত তাহার কেনা-বেচা এবং ব্যবসা করা না হইবে, সে পর্যন্ত তাহাতে যাকাত নাই। অবশ্য এই-সব জিনিসের তেজারত করিলে হিসাব করিয়া তাহার যাকাত দিতে হইবে। (পক্ষান্তরে সোনা এবং রূপা শুধু সিন্দুকে রাখা থাকিলে বা মাটির নীচে পুতিয়া রাখিলেও তাহার যাকাত দিতে হইবে।)

১৫। মাসআলা ঃ কাহারও নিকট যদি দশ পাঁচটা বাড়ী থাকে এবং তাহা ভাড়ার উপর দেয়, অথবা চার পাঁচ শত টাকার বাসন কিনিয়া তাহা ভাড়া দেয় (অথবা চার পাঁচ হাজার টাকার মোটর বা নৌকা কিনিয়া তাহা ভাড়া দেয় বা নিজের কারবার চালায়) তবে এইসব মালের উপর যাকাত নাই। মোটকথা, ভাড়ার উপর হাজার হাজার টাকার গাড়ী ঘোড়া চালাইলেও তাহার উপর যাকাত নাই। অবশ্য ভাড়ার টাকা নেছাব পরিমাণ হইলে এবং বৎসর অতীত হইলে তাহার উপর যাকাত ফরয হইবে, অথবা এইসব জিনিসের কেনা-বেচা করিলে এইসব জিনিসের উপরও যাকাত ফরয হইবে এবং মূল্য হিসাব করিয়া যাকাত দিতে হইবে।

১৬। মাসআলা ঃ পরিধানের কাপড় বা জুতা যতই ঘরে থাকুক না কেন এবং যতই মূল্যবান হউক না কেন তাহাতে যাকাত নাই, কিন্তু যদি তাহাতে খাঁটি সোনা বা রূপার কারুকার্য থাকে, তবে সোনা বা রূপার পরিমাণ নেছাব পর্যন্ত পৌঁছিলে (অন্য সোনা রূপা থাকিলে তাহার সহিত মিলাইলে বা পৃথকভাবে) তাহার যাকাত দিতে হইবে। অন্যথায় যাকাত দিতে হইবে না।

১৭। মাসআলা ঃ কাহারও নিকট যদি কিছু পরিমাণ সোনা বা রূপার জেওর থাকে এবং কিছু পরিমাণ তেজারতের মালও থাকে (কাপড়, জুতা, ধান বা পাট হইলেও) সবের মূল্য যোগ করিলে যদি ৫২৷৷০ তোলা রূপা বা ৭৷৷০ তোলা সোনার সমান হয়, তবে যাকাত ফরয হইবে, কম হইলে ফরয হইবে না।

১৮। মাসআলা ঃ (নিজের জমির পাট বা ধান এক বৎসর কাল ঘরে জমা করিয়া রাখিলে তাহার যাকাত দিতে হইবে না। শাদী বিবাহের জন্য, যিয়াফতের জন্য, নিজের বছরের খোরাকের জন্য চাউল গোলা করিয়া রাখিলেও যাকাত দিতে হইবে না।) মোটকথা, ব্যবসার নিয়তে যে মাল খরিদ করিবে উহা তেজারতের মাল হইবে এবং তাহার উপর যাকাত ফরয হইবে। নিজ খরচ বা দানের নিয়তে খরিদ করিলে পরে যদি ব্যবসার নিয়ত করে, তবে ইহা তেজারতের মাল হইবে না।

১৯। মাসআলা ঃ যদি কাহারও নিকট তোমার টাকা পাওনা থাকে, তবে পাওনা টাকার যাকাত দিতে হইবে। পাওনা টাকা তিন প্রকার। প্রথম প্রকার এই যে, হয়ত নগদ টাকা বা সোনা

রূপা কাহাকেও ধার দিয়াছ। অথবা তেজারতের মাল বাকী বিক্রয় করিয়াছ সে বাবত টাকা পাওনা হইয়াছে। এক বৎসর বা দুই তিন বৎসর পর টাকা উসূল হইল। এখন যত টাকায় যাকাত ওয়াজিব হয় পাওনা টাকা তত পরিমাণ হইলে অতীত বৎসরসমূহের যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হইবে। যদি একত্রে উসূল না হয়, তবে যখন এগার তোলা রূপার সমপরিমাণ টাকা উসূল হইবে তখন ঐ টাকারই যাকাত দিতে হইবে। যদি উহা হইতে কম উসূল হয়, তবে ওয়াজিব হইবে না। আবার যখন সেই পরিমাণ টাকা পাইবে, তখন ঐ পরিমাণ টাকার যাকাত দিবে। এরূপভাবে দিতেই থাকিবে। আর উসূলকৃত টাকার যাকাত যখন দিবে অতীত সকল বৎসরের যাকাত দিতে হইবে। আর যদি পাওনা টাকা নেছাব হইতে কম হয়, তবে যাকাত ওয়াজিব হইবে না। অবশ্য যদি তাহার কাছে অন্যান্য সম্পত্তি থাকে যে উভয় মিলিয়া নেছাব পুরা হয়, তবে যাকাত ওয়াজিব হইবে।

২০। **মাসআলা ঃ** দ্বিতীয় প্রকার যদি নগদ টাকা করয না দেয় বা তেজারতের মাল বিক্রয় না করে, তেজারতী ব্যতীত অন্য মাল বিক্রয় করিলে যেমন পরিবার বস্ত্র, গার্হস্থ্য সামগ্রী ইত্যাদি বিক্রয় করে এবং উহার দাম এই পরিমাণ বাকী আছে যে, যাকাত ওয়াজিব হয়, এই টাকা যদি কয়েক বৎসর পর উসূল হয়, তবে ঐ কয়েক বৎসরের যাকাত দেওয়া ওয়াজিব, আর যদি এক সঙ্গে উসূল না হয় বরং কিছু কিছু করিয়া উসূল হয়,তবে নেসাবে যাকাত পরিমাণ টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ওয়াজিব হইবে না। যখন সেই পরিমাণ পাইবে তখন ঐ কয়েক বৎসরের যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হইবে।

২১। **মাসআলা ঃ** তৃতীয় প্রকার এই যে, স্বামীর নিকট মহরের টাকা পাওনা ছিল। কয়েক বৎসর পর ঐ টাকা পাওয়া গেল। টাকা পাওয়ার পর হইতে যাকাত হিসাব করিতে হইবে। বিগত বৎসর সমূহের যাকাত ওয়াজিব হইবে না। ঐ টাকা পুরা এক বৎসর মওজুদ থাকিলে যাকাত ওয়াজিব হইবে; অন্যথায় নহে।

২২। **মাসআলা ঃ** মালেকে নেছাব যদি পূর্ণ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার (হাওলানে হাওলের) পূর্বেই যাকাত আদায় করিয়া দেয়, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে। আর যদি কোন গরীব লোক মালেকে নেছাব না হওয়া সত্ত্বেও কোথাও হইতে টাকা পাওয়ার আশায় আগেই যাকাত আদায় করিয়া দেয়, তবে তাহাতে যাকাত আদায় হইবে না; পরে যদি মাল পায়, তবে হাওলানে হাওলের পর হিসাব করিয়া তাহার যাকাত দিতে হইবে; পূর্বে যাহা দিয়াছে তাহা নফল ছদ্‌কা হইয়া যাইবে এবং তাহার সওয়াব পৃথকভাবে পাইবে, উহাকে যাকাতরূপে গণ্য করা যাইবে না।

২৩। **মাসআলা ঃ** মালেকে নেছাব লোক যদি কয়েক বৎসরের যাকাত এককালীন অগ্রিম দিয়া দেয়, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে। কিন্তু যে কয়েক বৎসরের যাকাত অগ্রিম দিয়াছে তাহার মধ্যে কোন বৎসরের মাল যদি বাড়িয়া যায়, অর্থাৎ যত টাকা হিসাব করিয়া যাকাত দিয়াছে, মাল তাহা অপেক্ষা বেশী হয়, তবে যত টাকা বাড়িয়াছে তাহার যাকাত পুনরায় দিতে হইবে।

২৪। **মাসআলা ঃ** আমীনের নিকট ১০০ টাকা মওজুদ আছে, আরও ১০০ টাকা অন্য কোন জায়গা হইতে পাইবার আশা পাওয়া গেল, এমতাবস্থায় বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই আমীন হয়ত পূর্ণ ২০০ টাকার যাকাত দিয়া দিল, এইরূপ দেওয়া দুরুস্ত আছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি বৎসর শেষে মাল নেছাব হইতে কম হইয়া যায়, তবে যাকাত মা'ফ হইয়া যাইবে এবং যাহা পূর্বে দেওয়া হইয়াছে তাহা নফল ছদ্‌কা হইয়া যাইবে।

২৫। **মাসআলা ঃ** কাহারও মালের উপর পূর্ণ এক বৎসর শেষ হইয়া গেল অথচ এখনও যাকাত দেয় নাই, এমন সময় তাহার মাল চুরি হইয়া গেল বা অন্য কোন প্রকারে যেমন বাড়ী